তাবলীগ : ৩

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে

একটি খোলা চিঠি

[সিতাপুর ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানের শারঈ নিরীক্ষণ]

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি

উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

আবদুল্লাহ আল ফারুক

অনূদিত

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে খোলা চিঠি

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে
খোলা চিঠি

[সিতাপুর ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানের শারঈ নিরীক্ষণ]

পত্রলেখক
মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি হাফিযাহুল্লাহ
উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৭ ঈ.
রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
✆ : 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা ✆ 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা ✆ : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : তানভীর এনায়েত
বর্ণবিন্যাস : মাদিনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৬০ [ষাট] টাকা মাত্র

MAOLANA SAD SAHEB SOMIPE
EKTI KHOLA CHITHI
Published by : Maktabatul Asad. Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 60.00 US $ 10.00 only.

সূ চি

১. আধুনিক প্রযুক্তি ও রেওয়াজি বস্তুর মাধ্যমে তাবলীগ ৯
২. মোবাইলে কুরআন শোনা ও পড়া কি কুরআনের অবমাননা!
মোবাইলে তোলা ছবি কি অকাট্য হারাম! ১৮
৩. তাওবা কবুল হওয়ার চতুর্থ শর্ত মানুষ ভুলে গেছে ২১
৪. তবকাতি জোড়ের মেহনত কি উম্মাহকে যবেহ করছে? ২৯
৫. একাকীত্ব ও নিভৃত বাস কি উম্মাহর সংশোধন
থেকে হতাশার বহিঃপ্রকাশ ৪৫
৬. খারেজি লুকমা গ্রহণ করা হবে না ৪৬
৭. কওমার হালতে দুআ পড়ার পীড়াপীড়ি ৫২
তা'দিলে আরকান ও কওমায় দুআপাঠ সম্পর্কে
মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের কিছু নির্বাচিত মন্তব্য ও ফতোয়া ৫৫
হাকিমুল উম্মাহ হযরত থানভি রহ. এর ফতোয়া ৫৫
৮. খুরুজ আল্লাহর নির্দেশ। না বেরোনো
আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ ৫৭
৯. কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কথা ৫৯
১০. আকাবির উম্মাহর খেদমতে বিনীত নিবেদন ৬১

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রিয় শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা সাদ সাহেব দা.বা.

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

মহান আল্লাহ আপনাকে সবসময় সুস্থ রাখুন। সব ধরনের অনিষ্টতা, ফিতনা, বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

কিছু দিন আগে আমি আপনার সমীপে ১৪ পৃষ্ঠার একটি চিঠি কুরিয়ার ডাকে পাঠিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই পেয়েছেন। সেখানে আমি এ কথা উল্লেখ করেছিলাম যে, আপনার যেসব বয়ান কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে, বা আমি নিজেও শুনেছি, সেখানে এমন অনেক কথা রয়েছে, যা কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থী এবং জমহুর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতাদর্শ থেকে চ্যুত। কিছু কথা ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসিনে কেরামের স্পষ্ট বক্তব্যের বিলকুল পরিপন্থী। আপনি সে কথাগুলো আপনার বয়ানে প্রচুর বলে থাকেন। এ কথাগুলো থেকে উম্মাহর কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। আমি নিবেদন করেছিলাম, পরবর্তী চিঠিতে কয়েকটি কথা আপনার খিদমতে নিবেদন করব। এই চিঠি সেই অঙ্গীকার পূরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আপনি তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। যদি বাস্তবেই কথাগুলো আপনার কাছে ভেবে দেখার মত ও সংশোধনযোগ্য মনে হয় তাহলে আপনি এর ওপর মনোযোগ দিন। ইতোপূর্বে যেসব বয়ান করেছেন, সেখান থেকে সরে এসে 'রুজু' করুন। রুজুর কথা সবাইকে জানিয়ে দিন, যেন উম্মাহ ভুল বোঝাবুঝি ও গুমরাহির শিকার না হয়।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি। এ চিঠিতে আমি যা কিছু নিবেদন করেছি, স্রেফ দ্বীনি দায়িত্ব ও নিজ যিম্মাদারি মনে করেই

নিবেদন করেছি। খোদা না খাস্তা, আপনার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে আমার কোনো ধরনের ব্যক্তিগত টানাপোড়েন নেই। অন্য কোনো সমস্যা ও জটিলতাও নেই। আলহামদুলিল্লাহ, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের অনুরোধের ঢেকুর গিলেও আমি কলম ধরিনি। কথাগুলো লেখার পর আমি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের খেদমতে পেশ করেছি। বড় বড় আহলে ইলম যখন সত্যায়ন করেছেন এবং প্রস্বস্তি প্রকাশ করেছেন, এরপরই আমি আপনার খেদমতে উপস্থাপন করছি। এগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো কথা লিখতে পারিনি। সময় পেলে সেগুলোও লেখার চেষ্টা করব। আমি নিজের বোধ-বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামকে দেখানোর পরই আপনার সমীপে নিবেদন করব।

আপনার কাছে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে, আমি যে কথাগুলো লিখেছি, তা আপনি আপনার বিশ্বস্ত উলামা ও মুফতিয়ানে কেরামের কাছে পাঠিয়ে শুদ্ধাশুদ্ধ জেনে নেবেন।

আল্লাহ না করুন, আমি যদি কোনো ভুল কথা লিখে ফেলি, বা ভুল বুঝে কলম ধরি তাহলে আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। ইনশাআল্লাহ, শুধরে নেব ও আমার মত প্রত্যাহার করব। আশা করি, আপনি আমার নিবেদনগুলো গ্রহণ করবেন।

ওয়াস-সালাম...

আপনার একনিষ্ঠ ভাই

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতাযুল হাদিস

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ

৭ মুহাররম ১৪৩৮ হিজরি

১. আধুনিক প্রযুক্তি ও রেওয়াজি বস্তুর মাধ্যমে তাবলীগ

ভূমিকা : সকল পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি, ফকিহ ও মুহাদ্দিস এ কথা লিখে এসেছেন, খোদ মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবদুল হাসান আলি নদভি রহ.-ও এক প্রবন্ধে এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, শরিয়াহর মাঝে দু' ধরনের বিধান রয়েছে। একটি হলো ওয়াসায়েল—মাধ্যম। অপরটি হলো মাকাসিদ—উদ্দেশ্য। মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত যে বিষয়গুলোতে শরিয়াহ বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো মাঝে পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কোনো সুযোগ নেই। যেমন, নামাযের ভেতর ও বাইরের বিধান, রাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি। এ বিধানগুলোকে ফিকাহবিদগণ 'আমরে তাআব্বুদি' শব্দে অভিহিত করে থাকেন।

এর বিপরীতে শরিয়াহর মাঝে এমন অনেক হুকুম-আহকাম রয়েছে, যেগুলোতে শরিয়াহ কোনো বিশেষ পদ্ধতি আবশ্যক করে দেয়নি; বরং সেগুলোর শর্ত-শারায়েত ও সীমারেখা-বলয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন, পোশাক-পরিচ্ছদের ধরণ ও কাট-ছাট। এক্ষেত্রে শরিয়াহ স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে স্বাধীনতার পাশাপাশি কিছু সীমারেখা বাতলে দিয়েছে। যেমন, টাখনুর নিচে পরা যাবে না, হাঁটুর উপরে তোলা যাবে না, ইত্যাদি।

ওয়াসায়েল—মাধ্যম শ্রেণির আহকামের ক্ষেত্রে শরিয়াহ সবাইকে যুগ ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতাকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শুধু অনুমতিই দেয়নি; বরং কার্যত উৎসাহও দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের এটাও অন্যতম শিক্ষা। শারঈ প্রয়োজন সামনে এলে অনেক সময় উপকারী আধুনিকতাকে গ্রহণ করাটা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

নদওয়াতুল উলামার চিরন্তন আদর্শ হলো, قديم صالح—উপযোগী ঐতিহ্যের সঙ্গে جديد نافع —উপকারী আধুনিকতার সমন্বয় সাধন। এতোক্ষণ বললাম শারঈ বিধানের কথা। যার প্রমাণ-উপাত্ত শারঈ বিভিন্ন কিতাবে বিস্তারিতভাবে বিবৃত রয়েছে। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. লিখেছেন,

> 'আল্লাহর দিকে, আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে ডাকা ফরয। এ দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে, ভাষণের মাধ্যমে অথবা লেখালেখির মাধ্যমে, প্রকাশ্যে অথবা নিভৃতে– অর্থাৎ যেকোনো ভাবে পালন করা যাবে। এর জন্যে কোনো ধরন নির্ধারিত নেই। দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, এমন প্রতিটি দল বা ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে তার পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোনো বিশুদ্ধ পদ্ধতি চয়ন করে নেবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দল যদি নিজ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস ব্যয় করার জন্যে কোনো সঙ্গত ও উপকারী পথ অবলম্বন করে তাহলে সেটিকে জায়েয-নাজায়েয ঠাওরানো বা তার ওপর কোনো শর্ত-নিয়মাবলি প্রয়োগ করার অধিকার কারো নেই। এটি তখন যখন তার পথ ও পদ্ধতির মাঝে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো নিষিদ্ধ বা দ্বীনের মূল লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়, এমন কোনো উপাদান যুক্ত না হবে। কাজেই দাওয়াতের পথ-পদ্ধতি চয়ন করার বিষয়টি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। কাজেই সব জায়গায় বা সব ব্যক্তির ওপর দাওয়াতের একটি ধরণ নির্ধারিত করে অহিলব্ধ বিধানের মতো চাপাচাপি করা কখনই সঠিক নয়।
>
> আমরা মাঝে-মাঝে অনুভব করি যে, একটি শ্রেণি মনে করে বেড়াচ্ছে যে, 'তাদের কর্মপদ্ধতিই সঠিক। যারা দ্বীনের খেদমত করতে চায়, তাদেরকে সবসময় ও সব জায়গায় ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। এর বাইরে অন্য সব পদ্ধতি ভুল। যতোক্ষণ পর্যন্ত তার বলা বিশেষ পদ্ধতির ওপর অন্যরা কাজ না করবে, তাদের সব চেষ্টা, প্রয়াস ও সাধনা ব্যর্থ।

বাইরের সবার সব চেষ্টা নিরর্থক।' বলার অপেক্ষা রাখে না, তাদের এ মনোভাবে ভারসাম্য নেই। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি খুবই বিপদজনক। যুগে যুগে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বিভিন্ন দল-উপদল-ফেরকা জন্ম নিয়েছে। হ্যাঁ, তার এ ধারণা রাখার অধিকার রয়েছে যে, এ পর্যন্ত বিভিন্ন জনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যেখানে উঠিয়ে এনেছে, তার আলোকে বলা যায়, এ কর্মপদ্ধতি উপকারী। যতক্ষণ পর্যন্ত এটিকে উপকারী মনে হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি কোনো বিশেষ পদ্ধতি প্রথার রূপ নেয় তাহলে তা স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ নিতে শুরু করবে। এভাবেই বিদআত জন্ম নেয়। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহওয়ালা সংস্কারকদের দায়িত্ব হবে, তারা তা সংশোধন করার চেষ্টা শুরু করে দেবেন। গজিয়ে ওঠা প্রথার মূলোৎপাটন করবেন। ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, কোনো কাজ প্রথম দিকে বিশুদ্ধ লক্ষ্য ও দ্বীনের কল্যাণকামিতার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে সেটি ভুল পথে চলে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মূল বাস্তবতা ও রুসম, সুন্নত ও বিদআত, বৈধ ও ফরযের মাঝে পার্থক্য করাটাই তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন বা দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞার প্রতীক।'

[তাবলীগে দ্বীন কে লিয়ে এক উসুল, খুতুবাতে আলি মিয়াঁ,
পৃষ্ঠা–৪৪২-৪৪৪, খণ্ড– ৫]

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. এর এই বিশ্লেষণ কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডেই রচিত।

এখন দেখুন, মাওলানা সাদ সাহেব দা.বা. লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে কী বলেছেন! হুবহু তার ভাষায় পড়ুন। তিনি লিখেছেন,

'কথা পৌঁছিয়ে দেওয়া তাবলিগ নয়। বরং নিজে সেই দাওয়াত বহন করে নিয়ে যাওয়া, অন্তরে ঢেলে দেওয়া– এটি হলো দাওয়াত। প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করে দাওয়াত পৌঁছানো 'ইতমামে হুজ্জত' এর জন্যে যথেষ্ট নয়। প্রতিটি প্রচারমাধ্যম

দাওয়াত নয়। দাওয়াত শুধু সেই পদ্ধতিতেই হবে, যে পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম রাদি. অবলম্বন করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়াই আসল দাওয়াত। এ পথেই গায়বি নুসরাত ও হিদায়াত আসে। কোনো মাধ্যম অবলম্বন করে দাওয়াত পৌঁছানো 'ইতমামে হুজ্জত' বা দায়মুক্ত হওয়ার মত প্রমাণ উপস্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আজ আমরা প্রথাগত পদ্ধতিগুলোকে যথেষ্ট মনে করছি; অথচ এটি যেমন আমাদের নিজেদের হিদায়াতের জন্যে যথেষ্ট নয়; তদ্রূপ অন্যদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট নয়। দাওয়াত তখনই হবে যখন সেটি সাহাবাওয়ালা তরিকায় হবে। সুযোগ পেলাম তো পত্রিকায় এক কলাম লিখে দিলাম, বর্তমান সময়ের এই রেওয়াজি পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। রেওয়াজি পদ্ধতিতে দ্বীন পৌঁছালে এর দ্বারা স্রেফ রেওয়াজের উন্নতি হবে, দ্বীনের উন্নতি হবে না। দাওয়াত তো শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতিকে বলে। সাহাবায়ে কেরামের মেহনতের তরিকাকেই দাওয়াত বলে। সর্বপ্রথম এই উম্মাত থেকে দাওয়াতের সুন্নাত উঠে যাবে। রেওয়াজি তরিকা ও প্রচারযন্ত্রের সহায়তায় দাওয়াত দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করা আদৌ যথেষ্ট নয়। এখন তো সবাই যন্ত্রের সাহায্যে দ্বীন প্রচার করে এবং এটাকেই উন্নতি মনে করে। চিঠি প্রেরণ ও লেখালেখির মাধ্যমে দাওয়াত হয় না। দাওয়াত হয় জামাতের মাধ্যমে। আল্লাহর ওয়াস্তে সবগুলো রেওয়াজি তরিকা ছেড়ে দাও এবং দ্বীনের দাওয়াত নিজে গিয়ে পৌঁছে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভর্নরদের কাছে চিঠি লিখেছেন, ডাক পাঠাননি। সাহাবায়ে কেরামের জামাত পাঠিয়েছেন।'

'রেওয়াজি তরিকাগুলো থেকে যত বেশি বাঁচবে, তত বেশি আল্লাহ তাআলা তরিকা ইলহাম করবেন। এর বিপরীতে যত বেশি রেওয়াজি তরিকা অবলম্বন করবে, তত বেশি দাওয়াতের

> সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাবে। দাওয়াত সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ওই ব্যক্তির ওপর ইলহাম হয় যে রেওয়াজি বিষয়গুলো থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে। এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, একটি ফ্যাক্স মেশিন রাখুন। আমি তাকে লিখেছি যে, 'দাওয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে ওই ব্যক্তির ওপর ইলহাম হয় যে রেওয়াজি বিষয়গুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।..."

(আযানের সূচনা ও শরঈ বিধানের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন,) সাহাবাগণ পরামর্শ দিলেন। উত্তরে নবিজি বললেন,

> এটি ইয়াহুদিদের পদ্ধতি। তখনই আযানের পদ্ধতি ইলহাম হয়েছে, পূর্ণ দাওয়াত ইলহাম হয়েছে। আর এটি হয়েছে রেওয়াজি তরিকা পরিত্যাগ করার কারণে।..."

এ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনার এক পর্যায়ে এ কথাও বলেন,

> 'সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মোবাইলের কারণে। মোবাইলের মাধ্যমে মাশওয়ারা দেওয়া ও দাওয়াত দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করছে। নিজে গিয়ে দাওয়াত দাও।'

মারকাযের অন্য এক যিম্মাদার তার বয়ানে বলেন,

> 'প্রথমে দাওয়াত। অতপর ইবাদত। দেখো, প্রথমে আযান। এই আযানের কারণে শয়তান পালায়। নামায পরে হয়। শয়তান পুনরায় ফিরে এসে ভাগানোর অপতৎপরতা চালায়। কাজেই প্রথমে দাওয়াত, অতপর ইবাদত।'

শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাদ সাহেব উপরিউক্ত কথাগুলো তাঁর মাগরিব পরবর্তী বয়ানে তিনবার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন। আমি নিজেই কথাগুলো শুনেছি এবং তৎক্ষণাৎ কলমবন্দি করেছি। হযরত নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, তাঁর এ কথাগুলো লক্ষ মানুষের মনে কতটা দাগ কেটেছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নসিহত করার সময় বা দ্বীন প্রচার করার সময় উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে বা ভয় দেখাতে গিয়ে কেউ যদি একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত অতিরঞ্জন করে, তাহলে সেটিকে ক্ষমাসুন্দর

দৃষ্টিতে দেখতে হয়। মন-মানসিকতা গঠন করার সময় এ ধরনের অতিরঞ্জন ক্ষমার্হ্য। কোনো সম্মানিত ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করলে সেটিকে ব্যাখ্যার ফাঁক-ফোকর দিয়ে বের করে আনা যায়। এখানেও আমরা টেনে-হিচড়ে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে পারি। কিন্তু সমস্যা হলো, উম্মাহর লাখো সদস্যের ওপর তাঁর এই নেতিবাচক বর্ণনাভঙ্গি এবং তাঁর বয়ানের কতটা মন্দপ্রভাব পড়তে পারে? বলুন, আধুনিক যন্ত্র ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সহায়তায়, বই লিখে, চিঠি পাঠিয়ে, কলমের সাহায্যে দ্বীন প্রচার করলে সেটি কি তাবলিগ হবে না? প্রচার ও প্রকাশন কি তাবলীগের প্রভাব সৃষ্টিকারী সুন্দর পদ্ধতিগুলোর একটি নয়? بلغ ما أنزل বাক্যের ما أنزل (অবতীর্ণ অহি) এর বলয় কী পরিমাণ বিস্তৃত? এই বিশাল বিস্তৃতিকে সামনে রেখে বলুন, দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ের তাবলীগ কি লেখালেখি ও গ্রন্থনা ব্যতিরেক এ যুগে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وما عليك إلا البلاغ (আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া)। এ আয়াতের আলোকে বলুন, অনেক স্থানে স্রেফ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে কি তাবলীগের হক আদায় হয় না? উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. এর পত্রাবলি, মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. এর পত্রাবলি– যা তাঁরা বিভিন্ন গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেছেন, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. আরব-অনারবের বিভিন্ন শাসকের কাছে যেই দাওয়াতি চিঠিগুলো লিখেছিলেন, তাঁদের সেই কাজগুলো কি তাবলীগ নয়? মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. পাকিস্তান রেডিওতে কুরআন কারিমের দরস দিতেন। বর্তমান সময়েও আরব-আযমের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার আলিমে দ্বীন আধুনিক যন্ত্র, প্রচারমাধ্যম ও যোগাযোগ মাধ্যমে —সাদ সাহেব যেগুলোকে রেওয়াজি জিনিস বলেছেন— এগুলোর সাহায্যে তাঁরা দ্বীন ও শরিয়তের ব্যাপক খিদমাহ আঞ্জাম দিচ্ছেন। এগুলোকে ব্যবহার করে দ্বীন প্রচার করছেন। বলুন, এগুলোর মাধ্যমে কি স্রেফ রেওয়াজের উন্নতি হচ্ছে? এগুলোর মাধ্যমে কি দ্বীনের প্রচার ও উন্নতি হচ্ছে না? বলুন, এগুলোর কারণে কি সুন্নত থেকে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে? এগুলোর কারণে দাওয়াতের সুন্নাত বিলুপ্ত হচ্ছে?

চিন্তার বিষয় হলো, সেখানে লাখ লাখ মানুষ উপস্থিত ছিল। এ ধরনের বয়ানের কারণে তাদের মনে কি এ কথা গেথে যায়নি যে, লেখালেখি ও বইপত্র রচনা এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় উলামায়ে কেরাম দ্বীনের যেই খিদমাহ আঞ্জাম দিচ্ছেন, তা তাবলীগ নয়। আসল তাবলীগ হলো, নিজে গিয়ে সরাসরি দাওয়াত দেওয়া, যা আমরা দিচ্ছি। এভাবে পূর্ববর্তী দাঈদের সঙ্গে, উলামায়ে কেরামের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করা হচ্ছে; শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা, এমনকি কটু কথা বলার পথ ধীরে ধীরে মসৃণ করা হচ্ছে যে, আসল দাওয়াত তো সেটাই, যা আমরা করছি। এর বাইরে যত রেওয়াজি তরিকা আছে, সব নিষ্ফল।

লক্ষ শ্রোতা এখন এ কথা বুঝে নিচ্ছে যে, মাওলানা সাদ সাহেব যে বয়ান করছেন, তার পুরোটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামসূত্রে বলছেন। কেমনযেন منزل من السماء—আসমান থেকে অবতীর্ণ। কেননা তিনি রেওয়াজি প্রথাগুলো ছেড়ে দিয়েছেন। যেভাবে রেওয়াজি বিষয় ছেড়ে দেওয়ার কারণে আযানের মতো ইসলামের পূর্ণ আহবানের তরিকা ইলহাম হয়েছিল, তদ্রূপ বর্তমান যামানায় এই তরিকাগুলোর ইলহাম হয়েছে। তাবলীগের এই বিশেষ পদ্ধতির ওপর পীড়াপীড়ি এবং অন্যসকল পদ্ধতি, যা প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে হচ্ছে, সেগুলোর ওপর নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি করা হচ্ছে। শরিয়াত যেসব ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে (অর্থাৎ দাওয়াতের পদ্ধতি) তিনি তাঁর বয়ানে সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করাকে আবশ্যক ও অপরিহার্য বানাচ্ছেন। যদিও বয়ানের শেষ দিকে এসে তিনি বলেছেন, 'অন্যান্য শাখা মাদরাসা ইত্যাদিও আবশ্যক...' কিন্তু তিনি মূল মানসিকতা ওভাবেই গড়ছেন।

রেওয়াজি বিষয়গুলো ত্যাগ করার কারণেই আযানের মতো দাওয়াত ইলহাম হয়েছে, এটাও ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। এখানে সূক্ষ্ম ইলমি ভুল আছে। আযান কি সেই অর্থের দাওয়াত, যেই অর্থের দাওয়াত হিসেবে তিনি প্রমাণিত করতে চান। 'দাওয়াতে তাম্মাহ' আযানের একটি উপাধী।

দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে আমরা সবাই স্বাধীন। আমরা দাওয়াতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি এবং এর অবয়বে সংযোজন-বিয়োজন করার অধিকার রাখি। বলুন, আযানের মাঝে প্রয়োজন অনুপাতে পরিবর্তন, যেমন ধরুন, মানুষ যখন খুব বেশি ঘুমিয়ে থাকে তখন কি আমরা ফজরের আযানে الصلوة خير من النوم বাক্যটি দু-বার না বলে চারবার বলতে পারব? মানুষ যখন নামায সম্পর্কে খুব বেশি গাফলতি দেখাবে তখন কি আমরা حي على الصلوة আরো বেশি পরিমাণে বলতে পারব? বাস্তবতা হলো, আযান সে অর্থে দাওয়াত নয়। বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইবাদতের এ পদ্ধতি একান্তই আল্লাহপ্রদত্ত। যার কারণে এই আযানের হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন-সংযোজনের অধিকার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আল্লাহপ্রদত্ত বিধানটি অবতীর্ণ হয়নি, শরিয়াহ এর অনুমোদন দেয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন বিধানের প্রয়োজনীয়তা ও রূপরেখা নিয়ে বিস্তর শলা-পরামর্শ হয়েছে। এখন এই বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর পরামর্শ করেও এর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার সুযোগ নেই।

নামাযের আগে আযান আসে। এই ধারাক্রমের সুযোগ ব্যবহার করে এ কথা বলা কীভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, প্রথমে দাওয়াত, এরপর ইবাদত। শরিয়াত তো নামাযের বিধান আগে দিয়েছে, আযানের বিধান পরে দিয়েছে। আর আযানের বিধান আবশ্যক হওয়ার পূর্বে তো আযানের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই ওই ব্যক্তির তো এ কথা বলা দরকার ছিল যে, প্রথমে শিক্ষা, পরে দাওয়াত। তাহলে কেন এমন পয়েন্ট বয়ান করা হচ্ছে, যা জ্ঞানের বিচারে ভুল; অথচ সেই ভুল কেন্দ্র করে অবান্তর বিতর্ক ছড়ানো হচ্ছে। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর যুগে ছিলো না, এ দাবীতে যদি রেওয়াজি ও আধুনিক প্রচার মাধ্যম পরিহার করা আবশ্যক হয়ে থাকে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফ্যাক্স ছিল না, মোবাইল ছিল না, কাজেই এ যুগেও তা দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে বলব, লাউড স্পিকারও তো আধুনিক যন্ত্র। তাহলে

তো তাঁর জোর নির্দেশনা অনুসারে বড় বড় ইজতিমা ও জলসায় এই লাউড স্পিকার ব্যবহার করা ঠিক হবে না। কেননা সাহাবায়ে কেরামের যুগে এই যন্ত্র ছিল না। এখন এই লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হলে দাওয়াতের সুন্নাতের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হবে! এতে দ্বীনের উন্নতি হবে না, বরং রেওয়াজি বস্তুর উন্নতি হবে!

তাঁর এই বয়ান শুনে লক্ষ মানুষের মনে কী মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর থেকে কী ফলাফল বেরুচ্ছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

২. মোবাইলে কুরআন শোনা ও পড়া কি কুরআনের অবমাননা! মোবাইলে তোলা ছবি কি অকাট্য হারাম!

মাওলানা সাদ সাহেব লাহারপুর ইজতিমায় মাগরিব পরবর্তী বয়ানে বলেছেন,

'মোবাইলে ছবি তোলা অকাট্য হারাম। এর হারাম হওয়া নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। অবয়বের পরিবর্তনের কারণে হুকুমের পরিবর্তন হয় না। এর প্রতি আমার অনেক ঘৃণা। আল্লাহ না করুন, আমি বদ দুয়া করে ফেলতে পারি। এগুলো শয়তানের চক্রান্ত যে, হারামকে হালাল বানিয়ে দাও। আকৃতির পরিবর্তনের কারণে হুকুমের পরিবর্তন হয় না। যার যার মোবাইলে ছবি আছে, সে যেন মুছে ফেলে। নয়তো ক্ষতি হয়ে যাবে। যেই মোবাইলে ছবি থাকবে সেখানে রহমতের ফেরেশতা আসবে না।'

তদ্রূপ মোবাইলে কুরআন কারিম শোনা ও পড়া— এটাও কুরআন কারিমের অবমাননা। (প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেন,) 'অহি এ পরিমাণ ভারি ছিল যে, ... لو أنزلنا هذا القرآن যদি কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ হত তাহলে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। সেই কুরআন আপনি মোবাইলের মাধ্যমে শোনবেন? কীভাবে আপনার মন সায় দিল?'

সন্দেহ নেই, মাওলানার এই বয়ান শুনে সবাই প্রচুর প্রভাবিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এটাই কি মূল বাস্তব? মাওলানা লক্ষ মানুষের সামনে যেই বিধান বললেন, সেটাই কি শরিয়তের বিধান? কুরআন কারিম মোবাইল বা অন্য কোনো আধুনিক ডিভাইসে দেখা, পড়া ও শোনা কি কুরআন কারিমের অবমাননা? মোবাইলে ছবি তোলা কি অকাট্য হারাম, এতে কি কারো কোনো দ্বিমত নেই? ক্যামেরা ও কাগুজে ছবির ব্যাপারে তো এ কথা বলা যেতে পারে যে, মিসরের উলামায়ে কেরাম ব্যতিরেকে আরব-

অনারবের সমস্ত নির্ভরযোগ্য উলামা এর অবৈধ হওয়া সম্পর্কে একমত। কিন্তু মোবাইল, সিডি, কম্পিউটার ইত্যাদি যন্ত্রের ভেতর ভেসে উঠা ছবি– কাগজে মুদ্রিত ছবির মতো যেগুলোকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় এবং যার নিজস্ব স্থিতি নেই। বরং এটি যন্ত্রের কৃতিত্ব যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্বের কোনো ঘটনার দৃশ্যায়ন করতে পারে, নয়তো তার ভেতর কোনো ছবি নেই। এমন ছবির ব্যাপারে কিছু কিছু আলেম জায়েযের ফতোয়া দিয়েছেন। অবশ্য আরব ও আযমের একদল আলেম এটিকেও নাজায়েয বলেন।

মোটকথা, এর ব্যাপারে হকপন্থী আলেমদের মতনৈক্য রয়েছে। তাহলে কীভাবে তিনি এই ছবিকে অকাট্য হারাম ও এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই, বলছেন? এটি নেহায়েত শাব্দিক ধরপাকড় নয়; বরং এথেকে জনগণ এ প্রভাব নিয়েছে যে, তাদের একটি বৃহৎ শ্রেণি এটিকে সম্পূর্ণ নাজায়েয মনে করে। এখন যদি কোনো আলেম বা দ্বীনদার ব্যক্তিকে ছবি তুলতে দেখে তাহলে সে তার সম্পর্কে এ অপধারণা করে যে, লোকটি হারামে লিপ্ত। যদি তাকে মোবাইলে কুরআন শুনতে বা পড়তে দেখে, তাহলে সে মনে করছে যে, সে কুরআনের অবমাননা করছে। তাঁর এ বয়ানের পরদিনই আমার কাছে একের পর এক ফোন এসেছে যে, মোবাইলে কুরআন পড়া ও শোনা কি বাস্তবেই তার অবমাননা?

বলুন, মোবাইলে কুরআন কারিম শোনা ও পড়া কী কারণে অবমাননাকর ও হারাম? এটি আধুনিক ডিভাইস, এ কারণে কি হারাম? না-কি অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজে মোবাইলের ব্যবহার বেশি হওয়ার কারণে হারাম? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তো একই কারণে লাউড স্পিকার ব্যবহার করাও হারাম হওয়া দরকার! লাউড স্পিকারে কুরআন পাক শুনলে এতে কুরআনের অবমাননা মনে করা দরকার! অথচ আমরা আমাদের অনেক মনীষীকে, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ.কে গভীর মনোযোগ সহকারে রমাযান মাসে আসর নামাযের পর টেপরেকর্ডারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত শুনতে দেখেছি। এ নিয়ে কাউকে আপত্তি করতে শুনিনি।

মাওলানা সাদ সাহেব .... لو أنزلنا هذا القرآن আয়াতাংশ দিয়ে যে দলিল দিয়েছেন, গুণীজনরা বেশ ভালো বুঝবেন যে, এ আয়াতের সঙ্গে এ বক্তব্যের কিসের সম্পর্ক? এটি একান্তই তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ, বা এটি তাঁর অভিরুচির বিষয়। অভিরুচির বিষয়কে শরিয়তের মাসআলা বানিয়ে উম্মতকে কেন বাধ্য করা হচ্ছে! কেন এ পরিমাণ ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে যে, বদ দুআ করতে মন উথলে উঠছে!

৩. তাওবা কবুল হওয়ার চতুর্থ শর্ত মানুষ ভুলে গেছে

ওই বয়ানেই মাওলানা এ কথাও বলেছেন,

> 'তাওবা পূর্ণ করা ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই নকল ও হরকত'। মানুষ তাওবার তিনটি শর্তের কথা জানে।... চতুর্থ শর্তের কথা জানে না। ভুলে গেছে। সেটা হলো, খুরুজ (আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া)।'

দলিল হিসেবে মাওলানা বনি ইসরাঈলের বিখ্যাত ঘটনাটি নকল করেন যে, এক লোক ৯৯ জনকে হত্যা করেছিল। ... (পুরো ঘটনা বলেন)। প্রথমে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী বলা হয়, যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে তপস্যা করে।... এরপর একজন আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ওই আলেম তাকে পরামর্শ দেন, তুমি আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো। পরামর্শ অনুসারে ওই খুনি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন। বুঝা গেল, তাওবার জন্যে খুরুজ জরুরি।'

মাওলানা তাঁর বয়ানে বনি ইসরাঈলের ৯৯ জনকে হত্যাকারী খুনির ঘটনা বিশদাকারে বয়ান করেন। এ বয়ানে তিনি পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে এ কথা প্রমাণিত করেন যে, ৯৯ জন লোককে হত্যাকারী ওই খুনি যখন সন্ন্যাসীর কাছে যায় তখনো তার তাওবা কবুল হয়নি। কিন্তু যখুনি সে অন্য বস্তির উদ্দেশ্যে 'খুরুজ' হয় তখন গিয়ে তার তাওবা কবুল হয়। বুঝা গেল, তাওবার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় খুরুজ জরুরি। এ ছাড়া তাওবা কবুল হয় না। এ শর্তটি সবাই ভুলে গেছে। সবাই তাওবার তিন শর্তের কথা বয়ান করে। চতুর্থ শর্ত অর্থাৎ খুরুজের কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

প্রশ্ন হলো, মাওলানা তাওবার চতুর্থ শর্ত হিসেবে যেই 'খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ' এর কথা বয়ান করলেন, পূর্ববর্তী উলামা, পরবর্তী উলামা,

ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিন যার কথা বয়ান করতে ভুলে গেছেন, এই চতুর্থ শর্ত তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? কুরআন কারিমের কোন আয়াত বা কোন হাদিস থেকে এ শর্ত উদ্ভাবিত? কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য তো এর বিপরীত মনে হচ্ছে।

১. তিরমিযি শরিফের বর্ণনায় এসেছে, সাইয়্যেদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদি. বলেন,

> مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
>
> 'কোনো ব্যক্তি যদি ছোট বা বড় কোনো গুনাহ করে, অতপর উঠে অযূ করে, নামায পড়ে (সালাতুত তাওবা আদায় করে) এরপর ইসতিগফার করে মহান আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করেন।'
>
> [মিরকাত, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৮, বাবুত তাতাওউ]

২. কুরআন কারিমের আয়াতেও অনুরূপ ভাষ্য রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

> وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا○
>
> 'আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে অথবা নিজের ওপর জুলুম করবে, অতপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা করবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়াদ্র পাবে। [১১০]

৩. ষষ্ঠ শতাব্দীর মুহাক্কিক বুযুর্গ আল্লামা ইবনে কুদামাহ আল মাকদিসি রহ. (মৃত ৬২০ হিজরি) তাঁর লেখা 'কিতাবুত তাওয়াবিন' গ্রন্থে নকল করেছেন যে, 'হযরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম প্রচুর দুআ করলেন; কিন্তু বৃষ্টির কোনো দেখা নেই। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ করলেন, আপনার দলে, আপনার সভাস্থলে এমন এক গুনাহগার বান্দা রয়েছে, যে চল্লিশ বছর ধরে গুনাহে লিপ্ত। তার কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না। সে যত দিন থাকবে, তার উপস্থিতিতে বৃষ্টি হবে না। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ঘোষণা

করলেন, এমন অবাধ্য গুনাহগার বান্দা যেন সভাস্থল থেকে উঠে চলে যায়। তাহলে বৃষ্টি হবে। তার কারণে গোটা সম্প্রদায়ের কষ্ট হচ্ছে। তার ঘোষণার পরও সভাস্থল থেকে কেউ উঠল না; অথচ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

মুসা আলাইহিস সালাম তখন আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে রব্বুল আলামিন, আপনি বলেছিলেন, এমন একজন অবাধ্য বান্দা উপস্থিত রয়েছে। তার কারণেই বৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু দেখা গেল, সভাস্থল থেকে কেউ উঠেনি; অথচ বৃষ্টি হচ্ছে!

উত্তরে আল্লাহ জানালেন, হ্যাঁ, আমার অবাধ্য বান্দা সেখানে উপস্থিত ছিল। ঘোষণার পরপরই লোকটি পূর্বের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করেছে। এখন আর সে অবাধ্য নেই। বাধ্য, অনুগত ও প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়েছে। এজন্যে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। পুরো বর্ণনাটি হলো,

وروي أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام فاجتمع الناس إليه .... فأوحى الله إليه ... ولكن فيكم عبد يبارزني منذ أربعين سنة بالمعاصي فناد في الناس حتى يخرج من بين أظهركم فبه منعتكم ... فقال في نفسه إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بني إسرائيل وإن قعدت معهم منعوا لأجلي فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله وقال إلهي وسيدي عصيتك أربعين سنة وأمهلتني) وقد أتيتك طائعا فاقبلني فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب... (كتاب التوابين، صـ ٦٢، مطبوعة بيروت، لبنان)

দেখুন, এখানে মাজমা বা অবস্থানস্থল থেকে উঠা ও খুরুজ বা বের হওয়ার কোনোটাই হয়নি; বরং পূর্বের অবস্থানস্থলেই বসে থেকে কাপড়ের ভেতর মাথা গুঁজে লোকটি তাওবা করেছিল। তার সেই তাওবা কবুলও হয়েছে। কাজেই একমাত্র সত্য এটাই যে, তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে খুরুজকে শর্তারোপ করা পুরোপুরি ভুল ও বাতিল।

৪. হযরত মোল্লা আলি কারি রহ. মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম গাযালি রহ. এর উদ্ধৃতিতে তাওবার সবচেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি নকল করেছেন। যার সারাংশ হলো, যখন তাওবার ইচ্ছা জাগবে তখন সবার আগে গোসল করো। এরপর ভালো কাপড় পরে সালাতুত তাওবা আদায় করো,এমন নিভৃত স্থানে যেখানে তোমাকে এক আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কেউ দেখবে না। গাযালি রহ. এর ভাষায়-

وقال الغزالي في المنهاج : إذا أردت التوبة تغتسل واغسل ثيابك، وصل ما كتب الله لك، ثم ضع وجهك الأرض في مكان خال لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. الخ (مرقاة،ج: ٣، صـ: ٣٦٩، باب التطوع)

দেখুন, ইমাম গাযালি রহ. ও মোল্লা আলি কারি রহ. তাওবার সর্বোত্তম পদ্ধতির কথা বাতলে দিচ্ছেন যে, একদম নির্জনে, নিভৃত স্থানে গিয়ে সত্য মনে তাওবা করো। যেখানে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ তোমাকে দেখবে না। ঘরের কোণে বসে, কামরার ভেতরে থেকে তাওবা করলেও সেই তাওবা কবুল হয়। আমাদের পূর্বসূরি ফুকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরদের মধ্য হতে একজনও তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে 'খুরুজ' এর শর্তারোপ করেননি।

৫. তাওবা সম্পর্কে মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. মাআরিফুল কুরআনে লিখেছেন,

> 'তাওবার জন্যে তিনটি শর্ত। এক. পূর্বের গুনাহগুলোর ওপর অনুতপ্ত হওয়া। দুই. যেসব গুনাহে লিপ্ত সেগুলো তৎক্ষণাৎ বর্জন করা। তিন. আগামীতে গুনাহ পরিহার করার পোক্ত ইরাদা করা। তবে যেসব গুনাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে, সেসব গুনাহের ক্ষেত্রে অবশ্যই মাফ করিয়ে নেওয়া, অথবা হক ফিরিয়ে দেওয়াও তাওবার শর্ত।'

তাওবার ব্যাপারে মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রহ. যে কথাগুলো লিখেছেন, সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী এ কথাগুলোই লিখে আসছেন। তাইতো দেখা যায়, মোল্লা আলি কারি রহ. মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة هذا كلام الراغب وزاد النووي وقال إن كان الذنب متعلقا ببني آدك فلها شرط آخر وهو رد المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه. (مرقاة،ج: ٥ صـ: ٢٣١اب الاستغفار والتوبة)

মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. তাওবার যেই সংজ্ঞা ও শর্ত উল্লেখ করেছেন, হাদিসের সকল ব্যাখ্যাকারক তার সঙ্গে একমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত অর্থাৎ চৌদ্দ শ বছর ধরে উম্মাহর সকল পূর্বসূরি ও পরবর্তী মনীষীগণ এ ব্যাখ্যাই দিয়ে আসছেন। সকল মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের বিপরীতে এতটা দুঃসাহসের সঙ্গে এ মন্তব্য করা যে, তাওবার তিনটি শর্ত লোকেরা বলে বেড়াচ্ছে আর চতুর্থ শর্তের কথা বেমালুম ভুলে গেছে! এ ধরনের দাবি কি সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস, পূর্বসূরি উলামা ও আকাবিরদের প্রতি অনাস্থা ও একযোগের সবার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তোলা নয় যে, তাওবার চতুর্থ শর্ত সম্পর্কে সবাই গাফেল!

মাওলানার এই আবিস্কার ও উদ্ভাবন কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, তাওবার জন্যে চতুর্থ শর্ত রয়েছে। তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে তিনি খুরুজকে অত্যাবশ্যক বলছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দলিল দিয়েছেন বনি ইসরাঈলের ৯৯ জনকে হত্যাকারী খুনির ঘটনাকে। তিনি বলছেন, ওই খুনি যখন অন্য বসতির উদ্দেশে বের হয় তখনই আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন।

মাওলানার এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি হাদিসের সকল ব্যাখ্যাকারক ও মুহাক্কিকের বিপরীতে স্রেফ নিজের বোধ-বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখছেন। আলোচনার খাতিরে যদি ঘটনাটিকে তাওবার একক দলিল হিসেবে ধরে নিই তাহলে প্রশ্ন ওঠবে যে, মুসলিম শরিফের হাদিসে এ বাক্য এসেছে—

إنطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن لها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك. (مرقاة، ج: ٥، صـ: ٢٣٩)

হাদিসে বলা হয়েছে, 'বের হয়ে আবিদদের কাছে অবস্থান করে ইবাদত করো।' এখানে স্পষ্ট বুঝে আসছে যে, 'খুরুজ' মোটেই উদ্দেশ্য হয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, আবেদ, দুনিয়াত্যাগী যাহেদদের সংস্পর্শে থেকে খানকায়ে সার্বক্ষণিক অবস্থান করো। এটাই প্রমাণসিদ্ধ কথা। কাজেই যদি তাওবার চতুর্থ শর্ত যুক্ত করতে হয় তাহলে বলতে হবে, আবিদদের সংস্পর্শে থাকাই তাওবার চতুর্থ শর্ত। শুধু খুরুজ শর্ত নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

বাস্তবতা হলো, কুরআন কারিমের কোনো আয়াত বা কোনো হাদিস থেকে তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে 'খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ' এর বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত নেই। কাজেই এ শর্ত বাতিল। এটি কুরআন ও হাদিসের পরিপন্থী উদ্ভাবন। এই শর্তের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলা হচ্ছে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর গুনাহ।

আবু দাউদ শরিফের 'কিতাবুল আদাব—শিষ্টাচার সংক্রান্ত অধ্যায়' এ হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বনি ইসরাঈলে দু'জন লোক ছিল। একজন ছিল গুনাহগার। অপরজন ছিল প্রচুর ইবাদতকারী। সে বারবার ওই গুনাহগারকে নসিহত করত যে, গুনাহ ছেড়ে দাও। একদিন সে বিরক্ত হয়ে বলে ফেলল—

والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة

'আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তোমাকে জান্নাত দেবেন না।'

এরপর দুজনেরই ইনতিকাল হয়। আল্লাহ দুজনের রূহ একত্র করেন। প্রথমে আবেদ লোকটিকে বলেন—

أ كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادراً؟

> অর্থাৎ তুমি কি আমার ব্যাপারে জানতে যে, আমি তাকে ক্ষমা করব না! যে জিনিস আমার নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ ক্ষমা করা, তুমি কি তার ঠিকাদার ছিলে!'

এরপর আল্লাহ নির্দেশ করলেন, ওই গুনাহগারকে জান্নাতে পাঠাও। আর অপরজনের ব্যাপারে নির্দেশ করেন, ওকে জাহান্নামে ফেলো।

হাদিসটি বর্ণনা করার পর হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, ওই সত্তার শপথ, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته—ওই তাপসী তার মুখ দিয়ে এমন এক মন্তব্য করে ফেলেছে, যা তার দুনিয়া ও আখেরাতের দুটোই ধ্বংস করেছে। [আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড–৫, পৃষ্ঠা–২৫৯]

বাস্তবেই মাওলানার এই মন্তব্য গভীরভাবে ভেবে দেখার দাবি রাখে। অত্যন্ত ভীতিপ্রদ কথা। তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে 'খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ' এর শর্তারোপের মাধ্যমে আসলে এ কথা বলা হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর রাস্তায় বের না হবে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তোমার তাওবা কবুল করবেন না। ঠিক এ ধরনের মন্তব্য বনি ইসরাঈলের ওপর আবেদ লোকটি বলেছিল যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তার ওই মন্তব্যের সঙ্গে মাওলানার এ কথাও মিলে যাচ্ছে যে, 'খুরুজ ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুল করবেন না। মাফ করবেন না।' পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বনি ইসরাঈলের ওই ঘটনায় ওই মুজতাহিদ আবেদ শুধু এক ব্যক্তিকে বলেছিল যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। আর এখানে মাওলানা সাহেব লাখ লাখ মানুষকে বলছেন যে, 'খুরুজ ব্যতিরেকে আল্লাহ তাওবা কবুল করবেন না।' বলা যায় না, বিনা দলিলে এ ধরনের শর্তারোপ আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই অপসন্দনীয় হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সত্যিকারের তাওবা করার তাওফিক দিন।

বাস্তবতা হলো, তাওবা কবুল হওয়ার জন্যে 'খুরুজ'কে চতুর্থ শর্ত দাবি করার মাধ্যমে মাওলানা প্রথমত নিজেই মারাত্মক পর্যায়ের ভুল করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সকল পূর্বসূরি ও অনুসরণীয় মনীষীদের সম্পর্কে এ কথা বলা যে, 'তাওবার এই চতুর্থ শর্তের কথা সবাই ভুলে গেছে' এটি

তাঁদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অপবাদ। এর মাধ্যমে সকল পূর্বসূরি আকাবির রহ. এর সঙ্গে বেয়াদবি করা হচ্ছে এবং নিজের জ্ঞানের গরিমা করা হচ্ছে। অথচ তার এ দাবি কুরআন-হাদিস ও সকল মুহাদ্দিসের ভাষ্যের পরিপন্থী।

আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে মাওলানা এত বড় ভুল করে ফেলেছেন যে, এর জন্যে প্রথমত তাঁকে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইসতিগফার করতে হবে। দ্বিতীয়ত তিনি যেভাবে লাখো মানুষের সামনে কুরআন-হাদিস পরিপন্থী বক্তব্য দিয়েছেন, তদ্রূপ তাকে লাখো মানুষের সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে, সেখান থেকে রুজু করে, সঠিক কথা বিশদাকারে বয়ান করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে হযরত থানভি রহ. এর ঘটনা পেশ করছি যে, তিনি একবার সর্বসাধারণের উদ্দেশে ওয়ায করার সময় বলেছিলেন, 'অমুক মাসআলায় আমি ভুল করেছিলাম।' এরপর তিনি বিষয়টি পূর্ণ ব্যাখ্যা করে সবাইকে জানিয়ে দেন।' প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মাওলানারও আবশ্যিক কর্তব্য হলো, তিনি এ আদর্শ অনুসরণ করবেন এবং আগামীতে এ ধরনের ইজতিহাদ ও এ জাতীয় বয়ান করার সময় আল্লাহর ওয়াস্তে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

৪. তবকাতি জোড়ের মেহনত কি উম্মাহকে যবেহ করছে?

লাহারপুর ইজতিমায় মাওলানা সাদ সাহেব তার বয়ানে বলেছেন,

> ‘আমাদের এখানে তাবকাতি জোড়ের স্থান নেই। তবকাতি জামাত... উম্মতকে পরস্পরে যুক্ত করে না; বরং উম্মতকে যবেহ করে। আমি মনে করি, ডক্টরদের জোড়, ইঞ্জিনিয়ারদের জোড়, তবকাতি জোড়, মসজিদওয়ারি জামাত– এই তরিকা উম্মতকে যবেহ করছে। খাওয়াসদের জোড় হবে, এটা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের মন-মানসিতার মাঝে বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। কর্মীদের সম্মিলন— এটি উম্মতের জন্যে ক্ষতিকর। কর্মীদের সম্মিলন মানে, কাজের অবনমন। এর বিপরীতে কর্মীদের ছড়িয়ে যাওয়া মানে কাজের উন্নতি। তোমাদের ইবাদতগুলো যদি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তোমাদের ইবাদত যদি পুরোপুরি মাকবুল হয়, তোমরা যদি তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাও; খোদার কসম করে বলছি, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খোদার নুসরত-সহযোগিতা পাবে না, যতক্ষণ উম্মত এক না হবে। কালো-সাদার ব্যবধান নিঃশেষ না হবে।
>
> আমাদের এ মেহনতে তবকাতি জোড়ের সুযোগ নেই। এটি তিরস্কারযোগ্য। যখন মুশরিকদের দলপতিরা চেয়েছিল যে, তাদের জন্যে পৃথক জোড় হোক তাহলে আমরা আপনার কথা শুনবো। আমাদের শর্ত হলো, যখন আমরা বিশেষ লোকেরা বসব তখন এই সাহাবারা, এই সুহাইব, বিলালরা আসতে পারবে না।... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায় দিলেন। লিখিত চুক্তি হলো। সিলমোহরও লাগানো হলো। জোড় শুরু হলো।... কিছু ক্ষণ পর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. এলেন। (এরপর পুরো ঘটনা বললেন) তখন এ

> আয়াত অবতীর্ণ হলো- عبس وتولّى... الخ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রাদি.-কে ডেকে নির্দেশ করেন, কাগজটি নিয়ে এসে ছিড়ে ফেলো।’ বুঝা গেল, এই তবকাতি জোড় আল্লাহর তিরস্কারের কারণ।
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনীর তাশকিল করে দিয়েছেন গরিবের সঙ্গে। ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদি.-কে ধনী মুআবিয়া রাদি. এর সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছিলেন। দারিদ্রতার কারণে তাঁর পায়ে জুতো ছিল না। সবাই তাকে তুচ্ছ চোখে দেখতেন; কিন্তু মুআবিয়া রাদি. বরদাশত করে নিয়েছিলেন।...

উপরের কথাগুলো মাওলানা সাদ সাহেবের ইজতিহাদ। যার ওপর তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে তিনি এই ইজতিহাদের ওপর তুলে আনছেন। ইজতিমাগুলো থেকে তিনি তবকাতি জোড় পুরোপুরি খতম করে দিয়েছেন। নয়তো পূর্বে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, রেলকর্মী অর্থাৎ বিভিন্ন পেশার লোকদের জন্যে তাদের স্তর, মনোভাব, মেধাগত যোগ্যতা ও সক্ষমতা অনুপাতে গুরুত্বের সঙ্গে জোড় হতো। কিন্তু মাওলানা এই আয়োজন তুলে দিয়েছেন। তবে অজ্ঞাত কারণে তিনি শুধু আলেমদের খাস জোড় বাকি রেখেছেন। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, তার বয়ান অনুসারে তো খাওয়াসদের জোড়ও ইসলামসম্মত নয়। মাওলানা সাদ সাহেব এত বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন স্রেফ তার নিজস্ব ইজতিহাদ, বোধ ও বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে। হায়! তিনি যদি তাৎপর্যপূর্ণ এই আয়োজনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে তাকিয়ে তার নিজেরই বলে বেড়ানো উসুল ও সম্মিলিত পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো। মাওলানা মুহাম্মদ রাবে হাসানি হাফিযাহুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম প্রমুখের মত শীর্ষস্থানীয় অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করেই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে সমীচিন হতো। যদ্দূর আমি জেনেছি যে, তার এই সিদ্ধান্তের কারণে নতুন, পুরাতন, ছোট-বড় প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। একের পর এক আপত্তি উঠে আসছে। আসলে এ ধরনের সিদ্ধান্তই ফেতনার দুয়ার খুলে দেয়।

এক্ষেত্রে আমি মনে করি, মাওলানা স্রেফ নিজের ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে যেই পদক্ষেপটি নিয়েছেন, তা কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শের পরিপন্থী। যা তিনি উম্মাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কথা যখন ধ্রুবসত্য যে, দ্বীনপ্রচারের ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো বিশেষ পদ্ধতিকে আবশ্যক করে দেয়নি এবং তাবলীগ ও জিহাদ হলো শরিয়তের এমন বিধান, যা পালন করার জন্যে ইসলাম কোনো বিশেষ ধরণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়নি; আমাদেরকে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেছে, কাজেই সেখানে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন, বিয়োজন ও সংযোজন সম্ভব। বিষয়টি উলামায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

এদতসত্ত্বেও এই আয়োজনকে মাওলানা কর্তৃক নাজায়েয বলা এবং তবাকাতি জোড়কে কুরআন ও হাদিসের আলোকে ভুল বলা; এমনকি এটিকে ধিক্কারজনক অভিহিত করা এবং এর ভিত্তিতে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কারের পাত্র হওয়া, উপরন্তু عبس وتولى এর আয়াতটিকে এর প্রতিপাদ্য ও দলিল অভিহিত করা এবং অনির্ভরযোগ্য তাফসিরের আশ্রয় নিয়ে ইচ্ছেমত পরিণতি বের করা ও এর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং উম্মতের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া কতটা সঠিক?

سورة عبس وتولى এর ব্যাখ্যায় মাওলানা যে কথাগুলো বয়ান করেছেন, আমি অনেকগুলো তাফসিরগ্রন্থ দেখেছি, কোথাও তেমনটি পাইনি; বরং এর বিপরীত ভাষ্য পেয়েছি। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. এর ওই ঘটনাকে কীভাবে এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন! অথচ দুটোই ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। সুরা আনআমের আয়াত ولا تطرد الذين... এর শানে নুযুল ভিন্ন। এর সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. এর বিশেষ ঘটনাকে যুক্ত করাও ভুল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুশরিক দলপতিদের প্রস্তাব মেনে নেওয়া, কাগজের ওপর লিখে দেওয়া, মোহর অঙ্কিত করা, তবকাতি জোড় শুরু হওয়া অতপর আল্লাহ তাআলার তিরস্কারের পাত্র হওয়া এবং হযরত আলি

রাদি.-কে ডেকে এনে কাগজটি নিয়ে আসার নির্দেশ করা ও ছিড়ে ফেলা— এ তথ্যগুলো আমি কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থে পাইনি। আমি বরং এর বিপরীত বক্তব্য পেয়েছি, যার সারাংশ নিম্নে তুলে ধরছি—

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সূরা আবাসার শানে নুযুল লিখেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় দলপতি উতবা, আবু জেহেল, উবাই ইবনে খলফ প্রমুখদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করবে— এ আশায় কথাবার্তা বলছিলেন। ইতোমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. কুরআন কারিমের কোনো একটি আয়াত শেখার উদ্দেশ্যে সেখানে চলে এলো। কাছে এসে নিবেদন করল, يا رسول الله علمني—হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন, সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুক। যেন তিনি তাদেরকে বোঝানোর কাজ সম্পন্ন করতে পারেন; কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. পীড়াপীড়ি করছিলেন। স্বভাবতই এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানিকটা বিরক্ত হন। সেই প্রেক্ষাপটেই সূরা আবাসার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। ইবনে কাসির রহ. শানে নুযুল সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতগুলোও নকল করেছেন।

> عن ابن عباس قوله: (عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى) قال: بينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبةَ بن ربيعة، وأبا جهل بنَ هشام، والعباس بن عبد المطلب-وكان يتصدى لهم كثيرا، ويحرص عليهم أن يؤمنوا- فأقبل إليه رجل أعمى-يقال له عبد الله بن أم مكتوم- يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم أنزل الله: (عَبَسَ وَتَوَلَّى... قال ابن كثير : ودّ النبي صلى الله عليه وسلم

أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعا ورغبة في هدايته. (ابن كثير، ج: ٤، صـ: ٤٧٠، سورة عبس)

আর وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ যা সূরা আনআমের আয়াত, তার ঘটনা ও শানে নুযুল এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যার সারাংশ আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর উদ্ধৃতি অনুসারে এমন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হযরত খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল, আম্মার রাদি. বসেছিলেন। ওই সময় কুরাইশদের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রিয় রাসূলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা ওই সাহাবিদেরকে রাসূলের পাশে বসে থাকতে দেখে বলল, হে মুহাম্মদ, আপনার কাছে কি আপনার স্বগোত্রের এই লোকগুলোকে ভালো লাগে? আপনি তাদের ওপর সন্তুষ্ট? এই নিম্নশ্রেণির লোকদের অনুগত হয়ে আমাদেরকে কি বসতে হবে? হে মুহাম্মদ, আপনি ওদেরকে আপনার পাশ থেকে সরিয়ে দিলে হতে পারে আমরা আপনার কথা শুনব ও আপনার আনুগত্য করব। সেই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ।

عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده: صهيب، وبلال، وعمار، وخباب، وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك، فنزلت هذه الآية: { وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ الآية. (ابن كثير، ج: ٢، صـ: ١٣٤، سورة انعام)

ইবনে কাসির রহ. এর উপর্যুক্ত কথাগুলো থেকে বুঝে আসে যে, ঘটনাদুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সূরা আবাসা সংক্রান্ত ঘটনায় মককার নেতৃবর্গ পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিল। প্রিয়রাসূল তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে

মাকতুম রাদি. পরে আগমন করেন। আর وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ এর আয়াতে সাহাবা রাদি. পূর্ব থেকেই নবিজির কাছে বসেছিলেন। মুশরিক দলপতিরা এসে সাহাবায়ে কেরামকে সরিয়ে দেওয়ার খাহেশ পেশ করে।

মাওলানা যে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের-মুশরিকদের প্রস্তাবনা অনুসারে তবকাতি জোড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাদের খায়েশ অনুসারে তা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, মোহর মেরে দিয়েছিলেন, এরপর তবকাতি জোড় শুরু হয়। ইত্যবসরে সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. চলে আসেন... ইত্যাদি– এগুলোর একটিও আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এর উদ্ধৃতি অনুসারে সঠিক নয়।

প্রথমতঃ ঘটনাদুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ঘটনাতে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. আসেননি। তাঁর যেই আগমনের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানিকটা ভ্রুকুঞ্চন করেছিলেন, তার ঘটনা ভিন্ন। মাওলানা ভিন্ন দুটি ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং সূরা আবাসার ঘটনাকে এই আয়াতের ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এবং তবকাতি জোড়ের সমালোচনা করে এটিকে তার দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। প্রথমতঃ মাওলানা যে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক দলপতিদের খায়েশ মুতাবেক ওই সকল দুর্বল সাহাবিদের তাড়িয়ে দিয়ে মুশরিক দলপতিদের জন্যে ভিন্ন আয়োজন করার কার্যত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন— এ কথা ভুল। তিনি সেই আয়োজনের কথা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন— এ কথাও ভুল। মোটেই শুদ্ধ নয়। সহিহ মুসলিমের বর্ণনা ও কুরতুবি রহ. এর তাফসির থেকে শুধু এতটুকু বুঝে আসে যে, মুশরিক দলপতিদের ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে প্রস্তাবটি মেনে নেওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল। তিনি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন; কিন্তু তা বাস্তবায়ন করেননি। এমন কোনো ঘটনাও ঘটেনি। জানি না, মাওলানা কীসের উদ্ধৃতিতে এ কথা বয়ান করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দুর্বল সাহাবিদেরকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে তবকাতি জোড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর তিরস্কার চলে

আসে। যার প্রেক্ষিতে তিনি আলি রাদি.-কে ডেকে প্রস্তাবনার কাগজ হাজির করেন এবং ছিড়ে ফেলে দেন। এ কথা আল্লামা কুরতুবি রহ. এর বক্তব্য অনুসারে সম্পূর্ণ ভুল। তার এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এক ধরনের মিথ্যা অপবাদ; কেননা তিনি কখনই এমন কাজ করেননি। তাফসিরে কুরতুবিতে এসেছে,

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم ، وإسلام قومهم ، ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ، ولا ينقص لهم قدرا ، فمال إليه فأنزل الله الآية ، فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم : فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع تحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل : ولا تطرد الذين الآية. (القرطبي، ج: ٦، صـ : ٢٧٨، سورة أنعام)

এখানে আল্লামা কুরতুবি রহ. পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, এমন ঘটনা বাস্তবে ঘটেনি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক দলপতিদের প্রস্তাবনা মেনে দুর্বল সাহাবিদেরকে নিজের কাছ থেকে পৃথক করেননি। হ্যাঁ, তার মনে এ ধরনের ইচ্ছা জেগেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। ফলে তিনি সে ইচ্ছা থেকে সরে আসেন।

মাওলানার এ বয়ান সম্পূর্ণরূপে ভুল যে, তিনি আলি রাদি.-কে লিখে দিয়েছিলেন এবং তার ওপর সিলমোহর মেরে দিয়ে ছিলেন।... একটি বর্ণনা (ইবনে কাসির রহ. যা গ্রহণ করেননি) সেখানে শুধু এতটুকু আছে যে, মুশরিক দলপতিদের প্রস্তাবনা মেনে তিনি আলি রাদি.-কে ডেকে কাগজ নিয়ে আসার নির্দেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অহি চলে আসে। ফলে তিনি তা বাস্তবায়ন করেননি। অর্থাৎ লেখালেখির কাণ্ড ঘটেনি। তাহলে এ কথা বলা কীভাবে সঠিক যে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও লিখে দিয়েছিলেন। এরপর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তিরস্কার চলে আসে তখন তিনি সেই কাগজ চেয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলেন।

যে বর্ণনায় হযরত আলি রাদি.-কে ডেকে এনে, কাগজ নিয়ে আসার কথা রয়েছে সেই বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সেই বর্ণনা নকল করার পর তার ওপর আপত্তি তুলেছেন। আপত্তির সারাংশ হলো, এ বর্ণনা সঠিক হতে পারে না। কেননা অবশ্যই এটি মককি যুগের আয়াত। আর বর্ণনার মাঝে যেই ঘটনা বিবৃত রয়েছে, তা আকরা' ইবনে হাবিস ও উয়াইনাহ ইবনে হিসন রাদি. সম্পর্কিত। এ দুজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন হিজরতের অনেক পরে। কাজেই এ বর্ণনা শুদ্ধ হতে পারে না। এমন একটি অশুদ্ধ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে মাওলানার এ ধরনের দলিল উদ্ভাবন করা বিলকুল ভুল।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বর্ণনাটি নকল করে কী মন্তব্য করেছেন, তা দেখুন,

قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري... إلى أن قال .... فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: "نعم". قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا، قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليًا ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال: { وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الآية فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة، ثم دعانا فأتيناه. قال ابن كثير : وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. (ابن كثير، ج: ٢، صـ : ١٣٥، سورة انعام)

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, ওই আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর সঙ্গে তবকাতি জোড়ের কোনো সম্পর্কই নেই। এখানে দায়সারাভাবে একটিকে অপরটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মাওলানা নিজের দাবির স্বপক্ষে এই আয়াতগুলো দিয়ে যেভাবে দলিল দিয়েছেন, তা আদৌ সঠিক নয়। তবকাতি জোড়ের প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মতি প্রকাশ করেছেন আর এ কারণে আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করেছেন, নাউজুবিল্লাহ, এটি নবিজির ওপর

মিথ্যা অপবাদ। নবিজি কখনোই এমন সিদ্ধান্ত নেননি। যেই বর্ণনার মাঝে এমন ঘটনার অল্পবিস্তর আভাস পাওয়া যায়, সেটিকে ইবনে কাসির রহ. গ্রহণই করেননি। যার বিবরণ আমরা একটু আগে দিয়েছি। এরপর মাওলানা নিজের দাবিকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্যে ওয়ায়েল ইবনে হুজর ও মুআবিয়া ইবনে স'লুক রাদি. এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এ কথা বলেছেন যে, ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদি. মুআবিয়া রাদি.-কে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এ কথা নিতান্তই অসমীচীন। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর শানে এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার দুয়ার না খুললেই ভালো হতো।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, লাখো মানুষের উপস্থিতিতে যখন এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারিত হবে, তখন নির্ঘাত সাধারণ মানুষ তা বলে বেড়াতে শুরু করবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। মুহাক্কিক আলেমগণ সূরা আবাসার শানে নুযুল ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. এর ঘটনায় এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ওই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমি এখন মককার কাফেরদের কাছে দ্বীন প্রচার করছি। যা দ্বীনের মৌলিক কাজ, বড় কাজ। আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম একটি ছোট্ট কথা জানতে এসেছেন, যা শাখা পর্যায়ের কাজ। আর স্বতসিদ্ধ নীতি হলো, মৌলিক কাজের তাবলীগ শাখাগত কাজের তাবলীগের ওপর প্রাধান্য পায়।

দ্বিতীয় কথা হলো, আবদুল্লাহ আমার নিজের লোক। আর ওই কাফেরদের খুব কষ্ট করে হাতের নাগালে পেয়েছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদের ভিত্তিতে ওই সময়ের জন্যে কাফেরদের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবিকে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই ইজতিহাদ সঙ্গত হয়নি। কারণ, যার মধ্যে আগ্রহ আছে, সে প্রাধান্য পাবে অনাগ্রহী ব্যক্তির ওপর। যেহেতু আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. আগ্রহ ও জানার ব্যাকুলতা নিয়ে এসেছিলেন, এজন্যে আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবিকে সচেতন করে দেন।

সচেতনতার আরেকটি কারণ হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. এর উপকারের দিকটি নিশ্চিত ছিল। অপরদিকে কাফেরদের উপকৃত হওয়াটা স্রেফ ধারণানির্ভর ও অনিশ্চিত। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, অনিশ্চিত উপকারের ওপর নিশ্চিত উপকার প্রাধান্য পাবে। এ কথা শায়খ থানভি রহ. তাঁর তাফসিরে লিখেছেন। মোটকথা, এখানে আল্লাহ তাঁর প্রিয়রাসূলের একটি ইজতিহাদি অসঙ্গতির ওপর সচেতন করেছেন। এর সঙ্গে তবকাতি জোড়ের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। আমি বুঝতে পারছি না, মাওলানা কীসের ওপর ভিত্তি করে এমন ইজতিহাদ করতে গেলেন? আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদি. এর ঘটনা সম্পর্কে আমাদের আকাবির ও গবেষক উলামায়ে দ্বীন যে কথা লিখেছেন, মাওলানা সেদিকে তাকাননি। পড়ে দেখার গরজও অনুভব করেননি। যদি তিনি সেই কিতাবগুলো পড়তেন তাহলে যেমন এ ধরনের বিচ্যুতির শিকার হতেন না, তদ্রূপ এ ধরনের উদ্ভট ইজতিহাদের দুঃসাহসও দেখাতেন না।

তবকাতি জোড় সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি : সিরাতের আলোকে

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যদি মূলনীতির দর্পণে বিষয়টি নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে এ কথা ফুটে উঠে যে, দাওয়াত ও তাবলীগ হলো শরিয়তের এমন বিধান, যেখানে শরিয়ত কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। পরিবেশ ও প্রয়োজন বিবেচনা করে যেকোনো পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগ করা যেতে পারে। দাওয়াতের এ দায়িত্ব একাকী পালন করা যেতে পারে, আবার সম্মিলিতভাবেও করা যেতে পারে। তবকাতি অর্থাৎ বিশেষ পেশার লোকদের একত্র করেও দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে, আবার পেশা-জীবিকা নির্বিশেষে একত্র করেও দেওয়া যেতে পারে। খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতে এমন ঘটনা প্রচুর ঘটেছে যে, তিনি পরিবেশ-প্রয়োজন বিবেচনা করে পেশার ভিত্তিতে লোকদের একত্র করেছেন। মুসলিম শরিফে আনসার যুবকদের একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভি রহ. তাঁর 'মুখতারাত' গ্রন্থেও ঘটনাটি নকল করেছেন যে,

১. একবার কিছু আনসারি নওজোয়ানের মনে হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চেয়ে তার বংশের সদস্যদের বেশি সম্পদ দিচ্ছেন। সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বের সঙ্গে শুধু আনসারি সাহাবিদের একত্র করেছিলেন। সেখানে যেন অন্য কেউ আসতে না পারে, তার ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। কারণ, এটাই ছিল তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবি। মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে,

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقال : أفيكم أحد من غير كم. (الصحيح لمسلم، ج: ١، صـ : ٣٣٨، كتاب الزكوة، حديث : ٢٤٣٦)

২. তিরমিযি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, একদল সাহাবি ব্যবসা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝেমাঝে সেই শ্রেণিকে সম্বোধন করে বিশেষ উপদেশ করতেন। কেননা ওই উপদেশ শুধু তাদের জন্যেই আবশ্যক ছিল। নবিজি একবার তাদের বলেছিলেন,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ. وفي رواية آخر : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ.

(السنن للترمذي، كتاب البيوع، باب : ٤، حديث : ١٢٢٤، ١٢٢٨، صـ : ٥٣١)

৩. মুসলিম শরিফের যাকাত অধ্যায়ে এ বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরি রাদি. একবার শুধু ক্বারীদের নিয়ে একটি মজলিস আয়োজন করেন। সেখানে তিনি তাদের উদ্দেশে বিশেষ বয়ান পেশ করেন। যার থেকে বুঝে আসে যে, মজলিসটি ছিল খাওয়াসদের ইজতিমা ও তবকাতি জোড়। বর্ণনায় এসেছে,

بَعَثَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثُمِائَةِ رَجُلٍ. الصحيح لمسلم، ج: ١، صـ : ٣٢٥

৪. বুখারি, মুসলিম ও মুয়াত্তা মালেকে মহামারী সংক্রান্ত অধ্যায়ে হযরত উমর রাদি. এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি একটি দ্বীনি অভিযানে যাচ্ছিলেন। সংবাদ এলো, সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। তখন তিনি তবকাতি তরিকায় পরামর্শ করেন। প্রথমে তিনি মুহাজির সাহাবিদের একত্র করে তাদের সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করেন। এরপর আনসার সাহাবিদের একত্র করে তাদের সঙ্গে পৃথক পরামর্শ করেন। সবশেষে তিনি কুরাইশের গণ্যমাণ্য লোকদের একত্র করে বৈঠক করেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أَهْلُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. .... ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيَ الأَنْصَارَ .... ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ الخ.

(الصحيح لمسلم، ج: ٢، صـ : ٢٢٩، باب الطاعون)

৫. মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিভিন্ন কিতাবেও প্রয়োজনের সময় স্তরভিত্তিক বিভাজনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাদিসের আলোকে মুহাদ্দিসিনে কেরাম উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। যেমন, ইমাম আবু দাউদ রহ. 'আদাব পরিচ্ছেদ' এ একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, باب في تنزيل الناس منازلهم। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ স্তর, পদমর্যাদা ও তাদের নিজ মেধা-যোগ্যতা অনুসারে আচরণ করা। এ শিরোনামের অধীনে এ হাদিস এনেছেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزلوا الناس منازلهم. দেখুন, বাযলুল মাজহুদ, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা– ২৪৭

এখানেও আগের কথা বলা হয়েছে যে, মানুষকে তাদের সমস্তরে রেখে দাও, তাদের সঙ্গে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে আচরণ করো। এর মাঝে কথাবার্তা, সম্বোধন, আচরণ— সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।

৬. ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহিহ গ্রন্থের ভূমিকায় বিশুদ্ধ সনদে এ ধরনেরই একটি বর্ণনা নকল করেছেন, যা তবকাহ তথা স্তরভিত্তিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করে। শুধু তাই নয়, বরং এই মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটলে ফেতনা ছড়িয়ে পড়তে পারে, সেই আশঙ্কাও জানানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন,

ما أنت بمحدث قوما لا يبلغه عقولهم إلا كا لبعضهم فتنة.

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أي يذكر عند العامة. (فتح الملهم، ج: ١، صـ: ٣٣٩)

যার অর্থ হলো, মুতাশাবিহাত তথা সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়বস্তু জনসাধারণের সামনে বয়ান না করা উচিত। অর্থাৎ তুমি কোনো দল বা গোষ্ঠীর সামনে এমন কোনো হাদিস বা দ্বীনি বিষয়বস্তু বলো না, যা তাদের বোধ-বুদ্ধি ও বিচেনার ঊর্ধ্বে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে এটি তাদের জন্যে ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যার পরিণতিতে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে বসতে পারে। এ বর্ণনাও স্তরভিত্তিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রমাণিত করে।

৭. ইমাম বুখারি রহ. 'কিতাবুল ইলম' এর মাঝে এই বিষয়বস্তুর ওপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখেছেন। باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا । যা প্রমাণিত করে যে, মানুষের বোধ-বুদ্ধির সীমারেখা অনুসারে জ্ঞান বিতরণ করা দরকার। এ অধ্যায়ের অধীনে তিনি হযরত আলি রাদি. এর উদ্ধৃতিতে নকল করেছেন—

حدثوا الناس بما يعرفون أ تحبون أن يكذب الله ورسوله.

আল্লামা আইনি রহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

المراد على قدر عقولهم. (عمدة القاري، ج: ٢، صـ: ٢٠٥، فتح الباري، ج: ١، صـ: ٢٩٨)

এ সবগুলো বর্ণনার সারকথা হলো, মানুষের সঙ্গে তাদের বোধ-বুদ্ধি-বিবেক ও তাদের স্বভাবগত মেধা-যোগ্যতা অনুপাতে কথা বলা দরকার। আর ধ্রুব সত্য হলো, বোধ-বুদ্ধির বিচারে সবাই একই স্তরের নন। সবার মেধার স্তর এক নয়। কাজেই প্রয়োজনের সময় তবকাতি তাকসিম একটি প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক পদক্ষেপ।

৮. দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার কিছু বুনিয়াদি মূলনীতি রয়েছে। সেই মূলনীতির আলোকেও তবকাতি তাকসিম আবশ্যক। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. লিখেছেন,

'আল্লাহর দিকে দাওয়াত, ইসলামের বিভিন্ন সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ, আল্লাহর এই দ্বীনের সত্যতা ও অক্ষুণ্নতার ব্যাপারে পৃথিবীবাসীকে আশ্বস্ত করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই এই প্রজ্ঞাচিত বিধান মেনে চলতে হবে। তা হলো—

كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله.

[কারওয়ানে যিন্দেগি, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা–১৪২]

৯. এই বাস্তবতাকে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. স্বরচতি গ্রন্থ 'আল-মুরতাযা' এর মাঝেও হযরত আলি রাদি. এর উদ্ধৃতিতে নকল করেছেন। যা তবকাতি জোড়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়টি প্রমাণসিদ্ধ করে। সেখানেও এসেছে—

عن علي : كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله.

[আল-মুরতাযা, পৃষ্ঠা– ২৮৯]

১০. তাবলীগের সুমহান প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এ কারণেই নিজ তাবলীগ জামাতে তবকাতি জোড় ও স্তরমাফিক মেহনত ব্যয় করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর বিষয়ে বিশেষ তাগাদাও দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর একটি দীর্ঘ চিঠি নকল করেছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন—

'প্রতিটি জাতির ভিন্ন ভিন্ন জামাত বানাতে আমি অনেক দিন যাবত তাগাদা দিয়ে যাচ্ছি। আজকের এই জলসায় দরকার

> ছিল, 'নাঈ' অঞ্চলের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন ভিন্ন জামাত যেন বের করা যায়, এই প্রচেষ্টা নিয়ে একটি জামাত দু-চার দিনের জন্যে এখানে মুকিম হয়ে আসবে। যা প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে পৃথক পৃথক জামাত বের করে নিয়ে আসবে। [মাকাতিবে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইলয়াস : ১৩১]

কারণ হলো, সবার চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা এক নয়। নদওয়ার মতাদর্শ হলো, আল্লাহর দিকে আহ্বান ও দ্বীনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার সময় ব্যক্তির মেধা ও বোধ-বুদ্ধি লক্ষ্য রাখাই প্রজ্ঞোচিত কাজ। মানবপ্রবৃত্তির এই স্বভাব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কুরআন-হাদিস, ইসলামি শরিয়াহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাহের দিকে তাকালে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট না হয়ে পারে না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা এবং জনতার মানসিক ও চৈন্তিক যোগ্যতা বিবেচনা করলে বুঝে আসে যে, তবকাতি জোড় একটি আবশ্যক ও অনিবার্য পদক্ষেপ। কাজেই এই পদক্ষেপকে ভুল, বাতিল এবং আল্লাহর তিরস্কারযোগ্য কাজ সাব্যস্ত করা কতটা সঠিক, তা পুনর্বিবেচনা করুন।

আমাদের পূর্বসূরি ও আকাবির হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ. হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহ. শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভি রহ. মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. প্রমূখের সময়কাল থেকেই এই তবকাতি জোড় আয়োজিত হয়ে আসছে। এতোদিন পর্যন্ত কেউ এটিকে ভুল, তিরস্কারযোগ্য ও দণ্ডনীয় মনে করেনি। কিন্তু আপনি এ সব যুক্তি-প্রমাণ থেকে অন্ধের মতো দৃষ্টি বন্ধ করে নিরেট নিজের ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে তবকাতি জোড় বিলকুল তুলে দিয়েছেন এ কথা বলে যে, ইসলামে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের স্থান নেই। এ কাজ আল্লাহর তিরস্কার বয়ে আনে। আমি জ্ঞানী-গুণী ও আলেমদের কাছে অনুরোধ করছি যে, আপনারা কুরআন-হাদিস ও শরিয়াহর মূলনীতির আলোকে বিচার করুন, এ দাবি কতটুকু সত্য। তিনি তার দাবির পক্ষে যে দলিল দিয়েছেন, তার সেই ইজতিহাদ কতটা বাস্তবাশ্রিত?

আমরা শুধু এতটুকুই বলব যে, এই তবকাতি জোড় একটি ব্যবস্থাপনামূলক পদক্ষেপ মাত্র। প্রয়োজনের সময় এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি ও স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে। যদি প্রয়োজন না থাকে, বা এর ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয়, সেসময় এ ধরনের পদক্ষেপ বন্ধও করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা আছে, কি নেই, সেটাই আসল বিবেচ্য। কিন্তু দলিল দিয়ে এটিকে ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী ঠাওরানো, ইসলামি আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাংঘর্ষিক অভিহিত করা এবং এ ধরনের পদক্ষেপকে আল্লাহর তিরস্কার নামিয়ে আনার কারণ সাব্যস্ত করাটা শতভাগ ভুল।

অথচ সেই ভুল সিদ্ধান্তের ওপর এখন চাপাচাপি চলছে। আমি উলামায়ে কেরাম ও জাতির বিবেচক ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারাই বলুন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করণীয়?

৫. একাকীত্ব ও নিভৃত বাস কি উম্মাহর সংশোধন থেকে হতাশার বহিঃপ্রকাশ

মাওলানা তাঁর বয়ানে বলেছেন—

> 'আল্লাহর রাস্তায় নকল ও হরকত হলো আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের নিশ্চিত মাধ্যম। যত বেশি নকল-হরকত হবে, তত বেশি তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ হবে, তত বেশি আত্মশুদ্ধি হবে। এর বিপরীতে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে খানকাহি জীবন হলো উম্মাহর ইসলাহ সম্পর্কে উদাসীনতার মাধ্যম। নির্জন-নিভৃত জীবন হতাশা সৃষ্টি করে। কোনো আমল, কোনো সাধনা ও নির্জনবাসের মাধ্যমে এই উম্মতের কল্যাণ আসবে না। এই উম্মাহর কল্যাণ একমাত্র দাওয়াত ইলাল খায়রের মাধ্যমেই আসবে। যদি পুরো উম্মাহ দ্বীনের ওপর উঠে আসে; কিন্তু দাওয়াতের ওপর না আসে তাহলে কল্যাণ আসবে না। রাহেব-সন্ন্যাসী তাকে বলে, যে উম্মাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে ইবাদত করে।
>
> নকল ও হরকতের কল্যাণে দ্বীন ছড়ায়, এটাই চিরন্তন নীতি। এর কোনো বিকল্প নেই। এটাই শাশ্বত সুন্নাহ। অন্য কোনো প্রস্তাব এর শূন্যতা পূরণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ দাওয়াতের মাঝেই ইয়াকিন ও পরিবেশ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রেখেছেন। নকল-হরকতের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর পথে বেরুলেই আত্মশুদ্ধি হবে।'

আরেক জায়গায় বলেছেন—

> হযরত মুসা আলাইহিস সালাম খালওয়াত ও আযলাত অর্থাৎ জনবিচ্ছিন্ন নিভৃত জীবন গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর সঙ্গে

> নিভৃতে কথা বলার জন্যে চলে গিয়েছিলেন। যার পরিণতিতে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল ধর্মচ্যুত হয়ে যায়।'

বলুন, মাওলানার এ ধরনের বয়ান তাসাওউফ, খানকাহ, ইহসান, আত্মশুদ্ধির মেহনত, সাধনা ও তপস্যার ব্যাপারে উম্মতকে কী বার্তা দেবে; অথচ এই মেহনতের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। খোদ মাওলানা ইলয়াস রহ. নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেছেন। তার এমন মন্তব্য কি খানকাহনিবাসী সুফিয়ানে কেরাম সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা ছড়াবে না? তাদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করবে না?

৬. খারেজি লুকমা গ্রহণ করা হবে না

মাওলানা সাদ সাহেব লাহারপুর ইজতিমায় লাখো জনতাকে সম্বোধন করে বয়ান করেছেন—

> ১. খারেজি লুকমা গ্রহণ করা হবে না। হানাফি মাযহাবে খারেজি লুকমা গ্রহণের নিয়ম নেই। নিলে সবার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। একমাত্র তার লুকমাই নেওয়া হবে, যে জামাতে শরিক হবে। ওয়াক্ত লাগায় না, গাশতে অংশগ্রহণ করে না, তা'লীমে আসে না; অথচ রায় জানাতে হাজির হয়ে যায়। রায় দিতে হলে জামাতে শরিক হয়ে যাও। খারেজি লুকমা গ্রহণের নিয়ম নেই। তদ্রূপ তোমরা যারা এ কাজে শরিক নও তোমাদের কোনো রায় গ্রহণ করা হবে না।
>
> ২. উম্মতের উদাহরণ হলো প্রবাহিত পানির মতো। পানি যতক্ষণ প্রবাহিত থাকে ততক্ষণ সেটির পবিত্রতা-অপবিত্রতার প্রশ্ন ওঠে না। এমন পানি তো অপবিত্রকেও পবিত্র করে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পবিত্রতা-অপবিত্রতার সকল প্রশ্ন স্রেফ বদ্ধ পানির ক্ষেত্রে। কুয়ো ও ঝরনাকে আলেমদের উদাহরণ হিসেবে পেশ করা ভুল। হাদিস শরিফে আলেমদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মেঘের সঙ্গে, যা গাশত-প্রদক্ষিণ করে করে বর্ষে।'

১.

এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, এ ধরনের উদাহরণ ও এ জাতীয় বয়ানের প্রভাবে সাধারণত উম্মতের কী ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠবে? 'খারেজি লুকমা গ্রহণ করা হবে না' উম্মাত এ বাক্যের কী অর্থ নেবে? এ অর্থই তো নেবে যে, যে সকল আলেম এই কাজের সঙ্গে কার্যত যুক্ত নন, সময় লাগান না, যদি তিনি মাসআলাও বলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধও করেন, তিনি যত বেশি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সৎপরামর্শ দেন না কেন, তার লুকমা গ্রহণ করো না। কেননা, সে আসল কাজের সঙ্গে জুড়েনি। দেখুন, মাওলানা কীভাবে সাধারণ জনগণকে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা, তাদের সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি করা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করার কাজটি কতটা শক্তভাবে করছেন! তার এ ধরনের বয়ানের কারণেই অনেক সাধারণ মানুষ সেই আলেমদের প্রতি নেহায়েত নাখোশ হয়ে থাকে, যারা এই মেহনতের সঙ্গে যুক্ত নন। যার কারণে এরা তাঁদের বয়ান শোনে না, তাঁদের কুরআন পাঠের দরসে বসে না, এমনকি তাঁদের কাছে কোনো মাসআলাও জিজ্ঞেস করে না। কারণ, খারেজি লুকমার কারণে নামায ফাসেদ হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. 'কারওয়ানে যিন্দেগি' এর মাঝে এ ধরনেরই একটি অনুযোগ তুলেছেন যে, তিনি এই দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে কিছু জরুরি পরামর্শ ও নির্দেশনা দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু খারেজি লুকমা মনে করে তার পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মাওলানা অনুযোগের সুরে কথাগুলো লিখেছিলেন। [কারওয়ানে যিন্দেগি, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা– ৩১৬]

পরিতাপের বিষয় হলো, মাওলানা সাদ সাহেব লাখো মানুষের উপস্থিতিতে সেই নসিহতটাই বিলি করছেন।

দ্বিতীয়ত যদি মূলনীতির আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, মাওলানার এই কিয়াস সঠিক নয়। কেননা নামাযের বাইরের ব্যক্তির লুকমা দেওয়া তো আদতেই সঠিক নয়। এ লুকমা গ্রহণ করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এই মাসআলাকে কেয়াসের প্লাটফর্ম বানিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারকে

তার ওপর কিয়াস করা কি আদৌ সঠিক, যা মাওলানা তার বয়ানে করেছেন? আদৌ সঠিক নয়। কেননা কিয়াস একমাত্র সেখানে করার অনুমতি রয়েছে, যেখানে নস বা আসমানি প্রত্যাদেশ নেই। নস বিদ্যমান থাকাবস্থায় কিয়াস করা মারাত্মক ভুল। দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি ও নির্দেশনা, সীমারেখা ও শিষ্টাচার সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের মাঝে সুস্পষ্ট নস-আসমানি প্রত্যাদেশ বিদ্যমান রয়েছে। এরপরও কিয়াস করার কী দরকার? সমস্ত ফকিহ ও উসুলবিদগণ এ ধরনের কিয়াস থেকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হলো, কিয়াস সঠিক হওয়ার জন্যে আবশ্যক শর্ত হলো, যার ওপর কিয়াস করছে এবং যাকে কিয়াস করা হচ্ছে, উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। যা এখানে নেই। নামায হচ্ছে, সত্ত্বাগতভাবে ইবাদত। শরিয়তের পরিভাষায় عبادت لعينه। এটি মূল লক্ষ্য। এর বিপরীতে দাওয়াত ও তাবলীগ হচ্ছে عبادت لغيره বা পরনির্ভরশীল ইবাদত। সাধারণ আলেমগণও এ দুটির পার্থক্য জানেন। উভয়টির বিধান ভিন্ন। যেমন, নামাযের জন্যে পবিত্রতা শর্ত, দাওয়াতের জন্যে নয়। নামাযের সময় কিবলামুখী হতে হয়, দাওয়াতের জন্যে হতে হয় না। নামায চলাকালে কারো সঙ্গে কথা বলা যাবে না। বললে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে; কিন্তু দাওয়াত দিতে হলে অবশ্যই কাউকে সম্বোধন করে কথা বলতে হয়। এ ছাড়া দাওয়াতই হয় না। এভাবে অনেকগুলো বৈসাদৃশ্য রয়েছে। মোটকথা, নামায ও দাওয়াতের বিধানের মাঝে পরিস্কার পার্থক্য রয়েছে। অথচ কিয়াস করতে হলে উভয়টির মাঝে সামঞ্জস্য আবশ্যক। উভয়টির মাঝে একই রকম 'ইল্লত' থাকতে হয়। কেননা কেয়াস বলা হয়, যখন কোনো ক্ষেত্রে নস বা আসমানি প্রত্যাদেশ পাওয়া যাবে না, তখন 'ইল্লত' এর মাঝে শিরকত রয়েছে, এমন বিধান থেকে ভাষ্য এনে উদ্ভূত সমস্যায় প্রয়োগ করা। বলুন, এখানে কিয়াসের দু' অংশের মাঝে এমন কোন 'সর্বব্যাপী ইল্লত বা কার্যোকারণ' রয়েছে, যার ভিত্তিতে আপনি দাওয়াত ও তাবলীগকে নামাযের ওপর কিয়াস করে খারেজি লুকমা গ্রহণ না করার তাগাদা দিলেন?

মাওলানার এই কিয়াস আসমানি প্রত্যাদেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা কুরআন ও হাদিসের মাঝে সম্পূর্ণ নিঃশর্তে, পূর্ণ ব্যাপকতার সঙ্গে অসংখ্য আসমানি প্রত্যাদেশ বিদ্যমান রয়েছে। تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ، بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، من رآي منكم منكرا فليغيره بيده الخ ।

এ ধরনের সবগুলো আসমানি প্রত্যাদেশ থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, শারঈ নিয়মাবলির বলয়ের ভেতরে থেকে প্রত্যেকেই অন্য ব্যক্তিকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে পারবেন। এর মাঝে দাখেলি-খারেজি তথা ভেতরস্থ ও বহিরাগতের কোনো প্রশ্নই নেই। কুরআন ও হাদিসে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিঃশর্তে। কুরআন যেই বিধান নিঃশর্ত দিয়েছে, সেই বিধানকে কোনো শারঈ প্রমাণ ছাড়াই শর্তযুক্ত করা ইসলামের মূলনীতির বিচারে সঠিক নয়। কাজেই দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়টিকে নামাযের বিধানের সঙ্গে যুক্ত করা এবং নামাযকে কিয়াসের প্লাটফর্ম বানিয়ে তার ওপর দাওয়াতকে কিয়াস করা দুনিয়ার কোনো ফকিহের মতে সঠিক হতে পারে না। আজ পর্যন্ত কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করেনি। 'দাওয়াত ও তাবলীগের মাঝে খারেজি লুকমা গ্রহণ করা হবে না' মাওলানার এ মন্তব্য খুবই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত হয়েছে। মানুষের বিবেক ও আল্লাহর দেওয়া শরিয়াহ– কোনো বিচারেই এটি যথার্থ নয়। আল্লাহ এই উম্মতকে হিফাযত করুন।

২.

যেসকল আলেম ও শায়খ লেখালেখি, শিক্ষকতা বা আত্মশুদ্ধির মেহনতের সঙ্গে যুক্ত, তারা প্রবাহিত পানি নন; তারা বদ্ধ পানি। তারা নাপাকির ঠিক পাড়েই অবস্থান করছেন। যেকোনো মুহূর্তে নাপাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদি তারা প্রবাহিত পানি হন তাহলে নাপাকও পাক হয়ে যাবে। প্রবাহিত পানির যদি রং স্বাদ ও তারল্য– এই তিন গুণ নষ্ট হয়ে যায়, তারপরও যেহেতু তা প্রবাহিত পানি; এজন্যে পাক।.... এ ধরনের উপমা ও বয়ান দিয়ে তিনি আলেমদেরকে, মাদরাসাগুলোকে ও বুযুর্গদেরকে সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। জানি না, কেন তিনি এভাবে কুধারণা ছড়িয়ে জনগণকে ফেতনায় ফেলছেন!

পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে আলেমদের উদাহরণ বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে হতে পারে। কুয়োর সঙ্গেও হতে পারে। মেঘের সঙ্গেও হতে পারে। অনেকগুলো হাদিসে আলেমদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে চতুর্দশীর চাঁদের সঙ্গে। যেই চাঁদ বাহ্যত একটি স্থানে স্থির থাকে; কিন্তু এর উপকারিতা, এর প্রভাব ও আলো কখনই লুকায়িত থাকে না। তারা বাতেনিভাবে এমনভাবে গাশত করেন যে, সবার চোখেও পড়ে না। এভাবেই তারা গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করে আসছেন। হাদিসে এসেছে,

إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب.

(رواه الترمذي، مشكوة، كتاب العلم، صـ : ٣٤)

'আবেদের ওপর আলেমের তেমনই শ্রেষ্ঠত্ব, যেমন শ্রেষ্ঠত্ব তারকাগুলোর ওপর চতুর্দশী চাঁদের।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাইয়্যেদুনা আবু সাঈদ খুদরি রাদি.কে উপদেশ করছিলেন। সেখানে বলেন, মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে আসবে। তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখো।' এখানে নবিজি তাঁকে কুয়োর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার পাড়ে এসে সবাই তৃপ্ত হয়। হাদীসের ভাষায়—

إن رجالا يأتونك من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. (رواه الترمذي، مشكوة، صـ : ٣٤)

এমনকি এমন আলেম, যে তার অবস্থানস্থলে থাকে আর ফরয নামায আদায় করেই জনগণকে দ্বীন শেখানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, নফল নামাযও আদায় করে না, তারও অনেক ফযিলত হাদিসে এসেছে। যেমন,

فضل هذا العالم يصلي المكتوبة فيعلم الناس الخير الخ. (مشكوة، صـ : ٢٦، دارمي)

আলেমদের মাধ্যমে জনতার এমন উপকার লাভ করাকে অনেক মুহাদ্দিস কুয়োর সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। কেউ কেউ প্রবাহিত ঝরনার সঙ্গেও উপমা দিয়েছেন। এর বিপরীতে যারা ভুল কথা ছড়ায় তাদেরকে লবণাক্ত ঝরণার সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। যেমন, এক বর্ণনায় এসেছে—

حماد بن زيد يقول لرجل بعد ما جلس مهدي ين هلال بأيام : مـا هذه العين المالحة؟ (مسلم، ج: ١، صـ : ١٨)

বুঝা গেল, আলেমদেরকে কুয়ো ও ঝরনার সঙ্গে উপমা দেওয়া বিভিন্ন হাদিসের আলোকে প্রমাণিত। মুহাদ্দিসিনে কেরাম এর ওপর আমলও করেছেন। দুঃখের বিষয়, মাওলানা সাদ সাহেব সেটাকে ভুল সাব্যস্ত করছেন। তার জিদ চেপেছে যে, তিনি অবশ্যই আলেমদেরকে প্রদক্ষিণকারী মেঘ-ই বানাবেন।

৭. কওমার হালতে দুআ পড়ার পীড়াপীড়ি

মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম নামাযে খুশু-খুযু' সৃষ্টি করার ওপর বেশ জোর দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে জোর দেওয়া উচিতও বটে। হযরত শাইখুল হাদিস রহ. ফাযায়েলে নামাযের মাঝে এ ব্যাপারে পুরো একটি অধ্যায় লিখেছেন। কিন্তু মাওলানা সাহেব খুশু-খুযু' তৈরি সৃষ্টি করার জন্যে সবচেয়ে বেশি জোর এর ওপর দেন যে, রুকু, সাজদা, কওমা— এগুলো যেন অনেক বেশি দীর্ঘ হয়। তিনি বলেন, রুকু-সাজদার তাসবিহগুলো খুব বেশি পরিমাণে পাঠ করা উচিত। কওমার সময় হাদিসে যেই দুআ এসেছে, তা অবশ্যই পড়তে হবে।' মাওলানার মতে খুশু-খুযু' তৈরির এটাই মাণদণ্ড। তিনি তার বিভিন্ন আলোচনায় এ কথাগুলো বলে থাকেন এবং এর ওপর চাপাচাপি করে থাকেন। সংক্ষিপ্ত কওমা ও সংক্ষিপ্ত রুকু-সাজদা করাকে তিনি নামাযের খুশুর পরিপন্থী মনে করেন। শক্ত ভাষায় এর প্রতিবাদ করে থাকেন। এক বয়ানে মাওলানা পুরো শক্তি ব্যয় করে বলেছেন, যা আমি নিজেও শুনেছি—

> 'ওই ইমামদের দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়, যারা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যখন কওমার হালতে থাকে, তখন হাদিসে বর্ণিত দুআটি নিজেও পড়ে না, অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দেয় না।'

হাদিস শরিফে এ দুআর কথা এসেছে,

> اللّٰهُمَّ ربنا لك الحمد ملأ السموات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيئ بعد أهل الثناء والمجد الخ.

অন্য রেওয়ায়েতে ভিন্ন শব্দে এসেছে।

মাওলানা নিজেও এর ওপর আমল করেন। অন্যদেরকেও এ দুআ পড়তে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। যেসকল ইমাম পড়েন না, তাদের ওপর আশ্চর্য প্রকাশ করে, প্রতিবাদ জানিয়ে থাকেন। মাওলানার বয়ান থেকে বুঝে আসে যে, তার মনে নামাযে খুশু তৈরির একক মাণদণ্ড হলো, কওমা,

রুকু ও সাজদা দীর্ঘায়িত করা। তিনি স্রেফ এটার ওপরই জোর দেন। তিনি মনে করেন, এটাই 'তা'দিলে আরকান'। তিনি তার এ অভিমতকে صلِّ فإنك لم تصَلِّ সহ অপরাপর হাদিস দিয়ে প্রমাণিত করার চেষ্টাও করে থাকেন।

প্রশ্ন হলো, এগুলো কি মাওলানার নিজস্ব ইজতিহাদ, না-কি অন্য কোনো মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব? মাওলানা খুশুর যেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা অন্য কোনো মুহাদ্দিস হাদিসের আলোকে দেননি। মোল্লা আলি ক্বারি রহ. এর পরিস্কার বক্তব্য অনুসারে খুশুর সম্পর্ক শুধু যাহেরের সঙ্গে নয়; বাতেনের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত। নামাযি ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। তার অন্তরের সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। খুশু' এর জন্যে অত্যাবশ্যক হলো, নামাযের সবগুলো আরকান যথাযথভাবে সুন্নাত মুতাবেক আদায় হতে হবে। সবগুলো মাকরুহ কাজ এড়িয়ে চলতে হবে, মুসতাহাব কাজগুলো গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে হবে। তিনি 'মিরকাত' গ্রন্থে লিখেছেন—

> وخشوعها بإتيان كل ركن على وجه هو أكثر تواضعا وإخباتا أو خشوعها خشية القلب وإلزام البصر موضع السجود وجمع الهمة لها والإعراض عما سواها ومن الخشوع أن يتوقي كف الثوب والإلتفات والعبث والتثاؤب والتغميض ونحوها وفيه إيماء إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون وهو يكون في الظاهر والباطن. (مرقاة شرح مشكوة، كتاب الطهارات، صـ : ١١، ج: ٢، حديث : ٢٨٦)

মাওলানা সাদ সাহেব কওমা দীর্ঘ করা, রুকু-সাজদা দীর্ঘ করাকেই তা'দিলে আরকানের বাস্তবায়ন সাব্যস্ত করছেন; অথচ হাদিসের সকল ব্যাখ্যাকার ও ফকিহদের সুস্পষ্ট বক্তব্যানুসারে এটি তা'দিলে আরকানের মাণদণ্ড নয়। তা'দিলে আরকানের জন্যে মাওলানা যেই দুআ পাঠের জেদাজেদি করছেন, সেটাও সঠিক নয়। এ দুআ সম্পর্কে হাদিসের ব্যাখ্যাকার ও ফকিহগণ কী বলেছেন, কী ফতোয়া দিয়েছেন, তা খুবই

সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আশা করি, এর মাধ্যমে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মাওলানার এ বক্তব্য কতটুকু সঠিক?

তা'দিলে আরকান ও কওমায় দুআপাঠ সম্পর্কে মুহাদ্দিসিন ও ফকিহগণের কিছু নির্বাচিত মন্তব্য ও ফতোয়া

১. في البدائع : وَأَمَّا إذَا كان إمَامًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَلَا يُطَوِّلُ على الْقَوْمِ لِمَا رَوَيْنَا من الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّ التَّطْوِيلَ سَبَبُ التَّنْفِيرِ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ.... وَيَقُولُ في السُّجُودِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. كَذَا رُوِيَ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه وهو عِنْدَنَا مَحْمُولٌ. (بدائع الصنائع، ج: ١، صـ : ٤٨٨)

২. وإذا رفع (أي من الركوع) قال : اللّٰهُمَّ ربنا لك الحمد... الخ، وعند أبي حنيفة ومحمد ذلك كله محمول على التطوع والتهجد، فإن الأمر فيه واسع، ويؤيده ما ثبت في صحيح أبي عوانة وسنن النسائي أنه عليه السلام كان إذا نام يصلي تطوعا قال : الله أكبر وجهت الخ. فيكون مفسرا لما في غيره. (كبيري شرح منية المصلي، صـ : ٢٦٨)

৩. اللّٰهُمَّ ربنا لك الحمد ملأ السموات الخ. أي يزاد في النوافل. (مرقاة شرح مشكوة، ج: ٢، صـ : ٥٥١)

٤. وجلس كل مصل بين السجدتين، وليس فيه ذكر مسنون، والوارد فيه محمول على التهجد. (مراقي الفلاح، صـ : ٢٨٤)

٥. ثم يرفع رأسه من ركوعه مستمعا ويكتفي به الإمام. (شامي، ج: ١، صـ : ٣٦٧)

٦. فإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده وهو الصحيح. (الفتاوى الهندية، ج: ١، صـ : ٧٤)

٧. وتطويل القومة والجلسة الذي ذكره أنس بن مالك في حديثه لـم يأخذ من الأئمة جمهورهم إلا الظاهرية، فلعله كان ذلك في ابتـداء الأمر، حين كان يطول صلوته ثم أمر بالتخفيف بعـده أو فعـل في الصلوة النفل. (بذل المجهود شرح أبي داؤد، صـ ٦٩، ج: ٢، الهندية)

٨. تعديل الأركان أي تـسكين الجـوارح قـدر تـسبيحة في الركـوع والسجود، وكذا في الرفع منهـا. فيمكـث في الركـوع والـسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه. (در مختار، شـامي، ج: ١، صـ ٣٤٣)

হাকিমুল উম্মাহ হযরত থানভি রহ. এর ফতোয়া

প্রশ্ন : ১৮৮। কওমা ও জলসার ব্যাপারে এ পুস্তিকায় দুআয়ে মাসুরা লেখা আছে। মুসলিম শরিফের একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়া রয়েছে। ইমাম সাহেব ফরয নামাযে পড়তে নিষেধ করে থাকেন। যদি সমীচীন মনে করেন, তাহলে এর কারণও জানিয়ে দেবেন।

উত্তর :

প্রথম ভূমিকা : ফরয নামাযে আসল হলো, জামাত।

দ্বিতীয় ভূমিকা : কিছু হাদিসে ইমামকে নামায সংক্ষিপ্ত করতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় ভূমিকা : উপর্যুক্ত দুআগুলোর বর্ণনায় নামায দীর্ঘ করার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কাজেই তিনটি ভূমিকা একত্র করলে বুঝে আসে যে, এ বর্ণনা নফল নামাযে প্রজোয্য।

উভয় উত্তরের বিশদ ব্যাখ্যা জানতে চাইলে ফিকাহর বিস্তারিত কিতাবাদি দেখুন। সেখান থেকে প্রয়োজন পরিমাণ অংশ 'ই'লাউস সুনানে' নকল করা হয়েছে। [ইমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড– ১, পৃষ্ঠা– ২০১]

এতক্ষণ আমরা বিশ্ববিখ্যাত ফকিহ, মুহাদ্দিসদের কিতাবাদি থেকে তা'দিলে আরকানের যেই বিবরণ এবং কাওমা ও দু সাজদার মধ্যবর্তী

জলসায় দীর্ঘ দুআ-যিকির পাঠের যেই বিধান নকল করেছি, তার আলোকে সবার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ইমাম সাহেব এ দুআগুলো কওমার মাঝে পাঠ করবেন না; বরং এগুলোর সম্পর্ক নফল ও তাহাজ্জুদের নামাযের সঙ্গে। আর তা'দিলে আরকানের সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থিরতার সঙ্গে। এটি স্রেফ দুআয়ে মাসুরা পাঠের ওপর নির্ভরশীল নয়। উপর্যুক্ত আলোচনাগুলো সামনে রেখে হযরত মাওলানা সাদ সাহেবের ওই ফরমান পরখ করে সিদ্ধান্ত নিন, যা তিনি শত শত মানুষের সামনে বলেছেন—

> 'ওই ইমামদের দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়, যারা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যখন কওমার হালতে থাকে, তখন হাদিসে বর্ণিত দুআটি নিজেও পড়ে না, অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দেয় না।'

দুআ না পড়ার ওপর এখানে নিন্দা করাটা কতটুকু শুদ্ধ? তার এ ধরনের বয়ান কি জনমনে আলেম-উলামা ও ইমামদের সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা ও পরিস্কার মাসআলার অপচিত্র ছড়াবে না? বলুন, কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করবেন? অদ্যাবধি মাঠে-ময়দানে যে বয়ানগুলো হয়ে গেছে, সেগুলোর প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করবেন? বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার আহ্বান রইল।

৮. খুরুজ আল্লাহর নির্দেশ। না বেরোনো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ

মাওলানা তার বয়ানে আল্লাহর রাস্তায় বেরুনোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন,

> ‘আল্লাহর পথে নকল-হরকত কম হওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। তাবলীগে বেরোনোর লক্ষ্য যদি এটা মনে করো যে, নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে তাহলে তা ভুল। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া খোদ আল্লাহরই নির্দেশ। যখন বেরুনোর নির্দেশ আসবে বেরিয়ে যাবে। إنفروا خفافا الخ যদিও নফিরে আমের নির্দেশ খতম হয়ে গেছে; কিন্তু মুতলাক নফিরের হুকুম খতম হয়নি। তাবুক অভিযানে তিনজন সাহাবি বের হননি। পুরো মদিনায় তাদের সঙ্গে একজনও কথা বলত না। ঘটনাটির মাধ্যমে উম্মতকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নকল-হরকত কম হওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। নকল-হরকত হল আল্লাহর মাগফিরাতের নিশ্চিত মাধ্যম। আল্লাহর রাস্তায় সামুদ্রিক অভিযানে যাওয়ার পর যদি কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তাহলে তার রূহ কোনো ফেরেশতা নয়; খোদ আল্লাহ নিজেই কবয করেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের রূহ ফেরেশতা বের করেছেন; কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় সামুদ্রিক সফরে বের হওয়া ব্যক্তির রূহ আল্লাহ নিজেই বের করেন। এ কথা মন থেকে বের করে দাও যে, এ সমস্ত ফযিলত ও সাওয়াব কিতাল ও জিহাদের জন্যে। না, বরং এ সকল ফযিলত আল্লাহর রাস্তায় খুরুজের জন্যে। فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً. الآية।

মাওলানা তার এ বয়ানে এমন কিছু দাবি তুলেছেন, এমন কিছু কথা পেশ করেছেন, যেগুলোর স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ। ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে। কিছু কথা তো পরিস্কার ভুল। মাওলানা ‘খুরুজ’-কেই লক্ষ্য ঠাওরেছেন। একে

‘মাধ্যম’ নয়; দ্বীনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অভিহিত করেছেন। এটি তার আদর্শিক ভ্রান্তি। দ্বিতীয়তঃ إنفروا خفافا الخ আয়াতটিকে দলিল হিসেবে পেশ করে এথেকে নফিরে আমের নির্দেশ করাও সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কুরআন কারিমের এই আয়াত থেকে এ কথা বোঝা এবং এটিকে প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত করা কুরআনের অর্থগত বিকৃতি। জিহাদ করা (শর্ত পাওয়া গেলে) সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া। অবশ্য কিছু কিছু বিশেষ প্রেক্ষাপটে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যার আলোচনা ফকিহগণ করেছেন। এমন প্রেক্ষাপটে গোলামেরও দায়িত্ব হবে যে, সে মনিবকে জিজ্ঞেস না করেই বেরিয়ে পড়বে। একেই ‘নফিরে আম’ বলে। তাবুক অভিযান সংঘটিত হয়েছিল এমনই এক প্রেক্ষাপটে। আপত্তির বিষয় হলো, যেই আয়াতগুলো নিরেট কিতাল ও জিহাদের বিশেষ সুরতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, সেগুলোকে দাওয়াত ও তাবলীগের ওপর প্রয়োগ করা এবং যারা বেরুবে না, তাদেরকে সেই ধিক্কার ও তিরস্কারের অভিযুক্ত ঠাওরানো– সুস্পষ্ট বিকৃতি ও কবিরা গুনাহ।

জিহাদ ও কিতালের সবগুলো ফযিলত দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ঘরত্যাগীরা পাবে, এ কথা একটা সীমারেখা পর্যন্ত সঠিক হলেও সর্বোতভাবে সঠিক নয়। যেই সীমাপর্যন্ত সঠিক, সেখানে শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ঘরত্যাগীরাই থাকবেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং তালিবুল ইলমরাও এ ফযিলতের ভাগিদার। যিনি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে, ফতোয়া জানতে বের হয়েছেন, কোনো অসুস্থ ব্যক্তির কুশল জানতে বেরিয়েছেন, নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের উদ্দেশে যিনি বের হয়েছেন, তারা সবাই আল্লাহর রাস্তায় আছেন। তাদের সবার এই খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহর মিসদাক বা প্রতিপাদ্য। এখন যদি কেউ সেই ফযিলতগুলোকে গুটিয়ে স্রেফ দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে বের হওয়া ব্যক্তির জন্যে খাস করে ফেলে, নির্ঘাত সেটি তার বিভ্রান্তি বিবেচিত হবে। তদ্রূপ এমন ব্যক্তিকে জিহাদ ও কিতালের সকল ফযিলতের অধিকারী সাব্যস্ত করাও পুরোপুরি সঠিক নয়। মাঝখানে মাওলানা বলেছেন, ‘গুলু বলা হয় হক অস্বীকার করাকে’ তার এ কথাও ভুল। গুলু বলা হয় সীমা অতিক্রম করাকে, যা মাওলানা নিজেই করছেন।

৯. কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কথা

ওই সফরে মাওলানা নদওয়াতুল উলামার মসজিদে আলোচনাকালে বলেছেন,

'আমার মতে ইলম ও যিকির একই জিনিস। যেটা ইলম, সেটাই যিকির। ইলমই যিকির।' দলিল হিসেবে তিনি فاسئلوا أهل الذكر الخ আয়াত পাঠ করেন। মাওলানার এই দাবি ও দলিল সঠিক নয়। তিনি কুরআন কারিমের অসংখ্য আয়াত ও রাসূলের অসংখ্য হাদিসের বিপরীতে এ দাবি উত্থাপন করেছেন। বিষয়টি বিস্তারিত বলতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পেশ করতে হবে।

মাওলানা তার সেই বয়ানে সকল ছাত্রকে একটি নসিহত বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, ব্যবসা, দাওয়াত ও শিক্ষকতা– এই তিনকাজ একসঙ্গে করো। শিক্ষকতা হবে বিনাবেতনে। বিনিময় ছাড়াই পড়াবে। জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবসা করবে।' মাওলানার এ কথাটিও স্বল্প অধ্যয়ন, অনভিজ্ঞতা ও আকাবিরের দ্বীনি আদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে তার অসচেতনতার প্রমাণ বহন করে।

বেতন নিয়ে পড়ানো– এটি যেমন মাকরুহ নয়, তেমনই উত্তমতার পরিপন্থীও নয়। এটি ইখলাস ও দ্বীনদারিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়। আমাদের আকাবির রহ. এ উপদেশ দিতেন যে, বেতন নিয়েই পড়াও। যদি আর্থিক প্রয়োজন না থাকে তবুও বেতন নিয়ে পড়াও। বেতনের টাকা পরবর্তীকালে রশিদ কেটে মাদরাসায় দান করে দাও। যদি বেতন না নিয়ে পড়াও তাহলে তোমার প্রবৃত্তি শয়তানের শিকারে পরিণত হবে। আস্তে আস্তে ক্লাসে অনুপস্থিত হওয়া শুরু করবে। পড়ানোর ক্ষেত্রে আগ্রহের কমতি দেখা দেবে। মুতালাআ না করেই পড়াতে শুরু করবে। নিসাব পুরো করবে না। তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে তলে তলে ইন্ধন দেবে যে, তুমি তো ফি সাবিলিল্লাহ পড়াচ্ছো। তোমার অনাগ্রহকে অন্যরা

ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এড়িয়ে যাবে। তাহলে দু ধরনের ক্ষতি হবে। প্রথমত দায়িত্বে অবহেলা আসবে। দ্বিতীয়ত প্রবৃত্তি আত্মমুগ্ধতা ও অহঙ্কারে জড়িয়ে পড়বে।' এটা হলো আমাদের আকাবির রহ. এর অভিমত। কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সেই কথাগুলোর মূল্য নেই। এজন্যে আপনি সকল ছাত্রের মানসিকতার মাঝে এ কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন যে, বেতন না নিয়ে পড়াবে। আর পড়ানোর পাশাপাশি ব্যবসা করবে। আর আপনার ভক্তরা মনে করছে যে, কথাগুলো আপনি ইলহামের সূত্রে পেয়ে বলছেন। আমরা সবাই কী পরিমাণ গাফেল ছিলাম যে, এ দিকে আমাদের কারো মনোযোগ উঠেনি!

একটু গভীরভাবে ভেবে বলুন, জ্ঞানচর্চা, গভীর গবেষণা ও শিক্ষকতার পাশাপাশি কি ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব? অথবা ব্যবসার পাশাপাশি কি একাগ্রতার সঙ্গে অধ্যাপনা করা যায়? খোদ কুরআন কারিমই তো কর্ম বণ্টন করে দিয়েছে। মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রহ. মাআরিফুল কুরআনের মাঝে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। আপনি মাআরিফুল কুরআনের ১১ নম্বর পারার সূরা তাওবার فلولا نفر من كل فرقة الخ আয়াতের ব্যাখ্যা পড়ে দেখুন। হযরত থানভি রহ. শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত লোকদেরকে গায়ে-গতরে ব্যবসায় নেমে পড়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। নেমে পড়লে কি কি ক্ষতি হবে, তার বিবরণও জানিয়ে দিয়েছেন। অথচ আপনি সবাইকে সেই হিদায়াতই দিচ্ছেন।

মাওলানা তার সেই বয়ানে, নফলের ওপর ইলমচর্চার ফযিলত শক্তভাবে অস্বীকার করেছেন। অথচ হাদিস শরিফে দিন-রাত নফল আদায়ে ব্যস্ত আবেদের ওপর শুধু ফরয আদায় করে সর্বক্ষণ পড়া ও পড়ানোয় নিমগ্ন আলেমকে শ্রেষ্ঠ অভিহিত করা হয়েছে। এবং তুলনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব তেমনই, যেমন সকল সাহাবি রাদি. এর ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। [দারেমি, মিশকাত শরিফ, পৃষ্ঠা– ৩৬]

১০. আকাবির উম্মাহর খেদমতে বিনীত নিবেদন

আমি মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের স্রেফ দু-তিনটি বয়ানই শুনেছি। তার সেই বয়ানে যে কথাগুলো সংশোধনযোগ্য ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিপাদ্য মনে হয়েছে এবং আমার অনুভূত হয়েছে যে, (তাঁর এই বয়ানগুলো উম্মতকে দ্বীনি ফায়েদা পৌঁছানোর পাশাপাশি) দ্বীনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব ও উম্মতকে সঠিক পথনির্দেশনার স্থলে ভুল প্রতিনিধিত্ব ভুল পথনির্দেশনা ও ভুল চেতনাগঠনে ভূমিকা রাখবে। এর ফলে দ্বীন ও উম্মাহর মারাত্মক ক্ষতি হবে। উলামা-মাশায়েখের সঙ্গে জনগণের, মাদরাসা ও খানকাহর সঙ্গে তাবলীগের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। তিনি তার বয়ানে প্রায়সময় ভুল তাফসির, বিকৃত ব্যাখ্যা ও মাসআলা বয়ান করার সময় বিভ্রান্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এমনকি নবি-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর শানে অমর্যাদাকর বাক্যও বলে থাকেন। এর থেকে উম্মাহকে বাঁচানো, এই পথ বন্ধ করা এবং যতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা ভরাট করা সকল উলামায়ে কেরামের যিম্মায় সামষ্টিকভাবে ফরযে কেফায়া। ইতোপূর্বে আমি এ ধরনের বেশ কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করে মাওলানা সাদ সাহেবের খেদমতে আঠারো পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি চিঠি নিবেদন করেছিলাম; কিন্তু পুরো কাজটি জাতির কর্ণধার আকাবিরের তাওয়াজ্জুহ ও পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী।

প্রয়োজন মনে করে উলামায়ে কেরামের জ্ঞাতার্থে দৃষ্টান্ত হিসেবে অল্প কিছু কথা আমি অধম উপস্থাপন করলাম। কথাগুলো আমি নিজেই তার কাছ থেকে শুনেছি। তার অন্যান্য বয়ান, যা বিভিন্ন ইজতিমায় তিনি প্রদান করেছেন, যদি সেগুলো নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে আল্লাহ মালুম, তার আরো অজস্র অতিরঞ্জন, সীমালঙ্ঘন এবং সত্যচ্যুত বক্তব্য ও ভারসাম্যহীন মন্তব্য সামনে চলে আসবে। খোদা না খাস্তা কারো

ব্যক্তিসত্তার ওপর আমি আক্রমণ করিনি। কারো সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বৈরীতা, বিদ্বেষ ও হিংসা নেই। বরং দ্বীন ও উম্মাহর হিফাযতের স্বার্থেই কথাগুলো লিখেছি।

কাজেই জাতির কর্ণধার উলামা, পৃষ্ঠপোষক আকাবির সমীপে আমার বিনীতি নিবেদন হলো, আমরা আপনাদের যাবতীয় দ্বীনি ব্যস্ততার পাশাপাশি এ বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি দিন। অধমের ত্রুটিপূর্ণ অভিমত হলো, এমন কোনো সঙ্গত পদক্ষেপ নিন, যা উম্মাহর মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং তাবলীগি কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবে। যেমন, আকাবির উলামার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম মাওলানা সাদ সাহেবের সবগুলো বয়ান পূর্ণ আমানতদারির সঙ্গে নিরীক্ষণ করবেন এবং সংশোধনযোগ্য কথাগুলো একত্র করে আকাবির উম্মাহর মাধ্যমে মাওলানার খেদমতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রেরণ করবেন। যেন তিনি আগামীতে এ ধরনের কথা ও এ জাতীয় বয়ান পরিহার করেন। ইতোপূর্বে যা বলে ফেলেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্যোগ নেন। মুহাক্কিক উলামা উদাহরণস্বরূপ হযরত থানভি রহ. এর কিতাবাদিও অধ্যয়ন করেন। আশা করি, এতে তিনি আগামীতে এ ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হবেন।

যদি এ দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা তার মাঝে না থাকে, যদি তিনি এমন হিম্মত না করেন, যদি এই মুবারক মেহনতের আমানত যথাযথভাবে হিফাযত করার সক্ষমতা তার মাঝে না থাকে তাহলে এই আমানত যথোপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে ও তাঁদের পরামর্শেই পরিচালিত হতে হবে।

মোটকথা, এই মেহনতের হিফাযতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা হয় তাহলে আশঙ্কা জাগে, যখন এ ধরনের ভারসাম্যহীন কথাগুলো (যার বিবরণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে) বিস্তৃত পর্যায়ে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে বলা হবে এবং সমাজে ছড়িয়ে পড়বে তখন খোদা না খাস্তা এই উপকারী জামাত ও বিশাল মেহনত —যা আমাদের জন্যে আল্লাহর নিআমত—

তা অবমূল্যায়নের শিকার হয়ে, আমাদের অমনোযোগের কারণে এবং যথাযথ হিফাযত না করার পরিণতিতে সাক্ষাৎ মুসিবত ও ফেতনার শিকার হতে পারে। মহান আল্লাহ হিফাযত করুন।

নোট : মহান আল্লাহ তাওফিক দিলে এ জাতীয় আরো কিছু কথা ইনশাআল্লাহ আগামীতে নিবেদন করব।

ওয়াস সালাম

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
১১ জুমাদাস সানি **১৪৩৬** হিজরি

ইতোমধ্যে এ সিরিজের আরো দুটি বই
প্রকাশিত হয়েছে–

নিযামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য

সংকলক

চৌধুরি আমানত উল্লাহ
সদস্য, মজলিসে আমেলা
মাদরাসায়ে কাশেফুল উলুম বাংলাওয়ালি মসজিদ,
হযরত নিযামুদ্দিন বস্‌তি, দিল্লি

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে
কিছু নিবেদন

সংকলক

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস
নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি। এ গ্রন্থে আমি যা কিছু নিবেদন করেছি, স্রেফ দ্বীনি দায়িত্ব ও নিজ যিম্মাদারি মনে করেই করেছি। খোদা না খাস্তা, আপনার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে আমার কোনো ধরনের ব্যক্তিগত টানাপোড়েন নেই। অন্য কোনো সমস্যা ও জটিলতাও নেই। আলহামদুলিল্লাহ, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের অনুরোধের ঢেকুর গিলেও আমি কলম ধরিনি। কথাগুলো লেখার পর আমি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের খেদমতে পেশ করেছি। বড় বড় আহলে ইলম যখন সত্যায়ন করেছেন এবং প্রস্বস্তি প্রকাশ করেছেন, এরপরই আমি আপনার খেদমতে উপস্থাপন করছি। এগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো কথা লিখতে পারিনি। সময় পেলে সেগুলোও লেখার চেষ্টা করব। আমি নিজের বোধ-বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামকে দেখানোর পরই আপনার সমীপে নিবেদন করব।

আপনার কাছে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, আমি যে কথাগুলো লিখেছি, তা আপনি আপনার বিশ্বস্ত উলামা ও মুফতিয়ানে কেরামের কাছে পাঠিয়ে শুদ্ধাশুদ্ধ জেনে নেবেন। আল্লাহ না করুন, আমি যদি কোনো ভুল কথা লিখে ফেলি, বা ভুল বুঝে কলম ধরি তাহলে আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। ইনশাআল্লাহ, শুধরে নেব ও আমার মত প্রত্যাহার করব। আশা করি, আপনি আমার নিবেদনগুলো গ্রহণ করবেন।

আপনার একনিষ্ঠ ভাই

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদ
আশুলিয়া, ঢাকা
015 11 52 50 70

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।
019 24 07 63 65

ISBN NO: 978-984-93084-0-9

ডিজাইন: আনজীর এলাহেত: ০১৭১২০৮৯১০২